কলরব

সাহিত্য পত্রিকা

কলরব

(RNI কর্তৃক ভেরিফায়েড টাইটেল)

জানুয়ারি সংখ্যা

কলরব এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি

৩৪ নং জাতীয় সড়ক * আমডাঙ্গা * উত্তর ২৪ পরগনা

facebook.com/kolorobecs

www.kolorobecs.org

কলরব এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটির পক্ষ থেকে
মো: রফিউল্লাহ কর্তৃক কলরব প্রকাশনী (আমডাঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগনা) থেকে প্রকাশিত।

কলরবের নেপথ্যে

রুবিনা নাসরিন, রাসেদুল হক, মানবেন্দ্র সাহা,
আজহারুল ইসলাম, মোঃ আলী রেজা, রামিজ রাজা,
ফিরোজ আহমেদ, সুজাউদ্দিন মণ্ডল, সমীরণ সাপুই,
মোঃ নিজাম, সরফরাজ ইসলাম, ভাস্কর পাল,
শেখ নিয়ামত ইসলাম, সাবির আহমেদ,

উপদেষ্টামণ্ডলী

সম্রাট মৈত্র, শমিক সেন, রেজাউল হক, ড. শেখ কামালউদ্দিন,
আহমেদ শাকির, ড. আসরফী খাতুন

'কলরব' এর এই সংখ্যাতে প্রকাশিত সমস্ত লেখাগুলির দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে লেখক/লেখিকার। যদি কোন লেখার সঙ্গে আংশিক বা সম্পূর্ণ মিল থাকে তবে 'টিম কলরব' কোনভাবে দায়ী নয়। প্রকাশনা সংস্থা ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোন অংশ কোন মাধ্যমের সাহায্যে কোনরকম পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিনিময় মূল্যঃ ন্যূনতম ২০ টাকা

কলরবের কথা মুখ

অনিবার্য অথচ আশায় অভূতপূর্ব। নব্য স্বাভাবিকতার সঙ্গে তাই সনাতনের আকুল আকাঙ্খা। অতিমারীর বিশ পাড়ি দিয়ে তাই কামনা সার্বিক একমেবায় একুশ। যার সংখ্যা - সংজ্ঞায় মিশে আছে সাহস ও সাবালকত্ব, আছে উদ্যম ও উন্মেষ। একুশের এই অনুপম নির্যাস আপন করে কলরব ই- সরণীতে মুখর হল। সঙ্গে রইল বারো মাস ধরে সরব থাকার প্রতিশ্রুতি। পাথেয় নিশ্চিতভাবেই লেখক- পাঠক মহলের সানন্দ সমর্থন। পাঠযাপনের কলরব এভাবেই হোক আবহমান।

প্রকাশকের তরফে বিনীত অনুরোধ

'কলরব এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি' 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট,1961' দ্বারা স্বীকৃত একটি অলাভজনক সামাজিক সংগঠন। সারা বছর ধরে নানা সামাজিক কাজকর্ম করে থাকে এই সংগঠন। দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে কোচিং , 'পাঠযাপন' গ্রন্থাগার, কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা, 'কলরব সাহিত্য সম্মাননা' প্রদান ,বিনামূল্যে মকটেস্ট ,শিক্ষামূলক ভ্রমণ সহ আরো অনেক কিছু । কোভিড ১৯ মহামারী পরিস্থিতিতে শতাধিক পরিবারের হাতে খাদ্যদ্রব্য তুলে দিয়েছে এই সংগঠন ।

তাই আপনাদের সকলের কাছে বিনীত অনুরোধ দয়া করে এই পিডিএফ বা ই-বুক টি কারও সঙ্গে শেয়ার করবেন না । বিনিময় মূল্য দিয়ে তবেই পিডিএফ বা ই-বুক টি নেবেন । নিশ্চিত থাকবেন আপনার দেওয়া অর্থসাহায্য সামাজিক কাজে ব্যবহৃত হবে ---- কোন ছাত্র/ছাত্রী বই, খাতা বা সরাসরি অর্থ সাহায্য পেতে পারে অথবা 'পাঠযাপন' গ্রন্থাগারে নতুন বইয়ের সংযোজন হতে পারে। কলরবের হাত শক্ত করুন। কলরব পরিবারের পাশে সর্বদা আপনারা থাকবেন এই আশা রাখি।

Pdf বা e-book নিতে চাইলে নিচে প্রদত্ত সোসাইটির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে নূন্যতম ২০ টাকা পাঠিয়ে স্ক্রিনশট ৮২৭৬৮৩৯৩৮০ নম্বরে বা facebook.com/kolorobecs এই ফেসবুক পেজের ইনবক্সে পাঠিয়ে দিন। Pdf বা e-book আপনাকে হোয়াটস অ্যাপ বা ই-মেলের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

Account Name : Kolorob Educational and Cultural Society
Bank Name : HDFC Bank Ltd.
Account No : **50100383733271**
IFSC : **HDFC0000352**

এবারের সংখ্যায়

প্রাণের পরে	সুমনা ভট্টাচার্য	০১
নিজস্ব নিরালা	মহঃ আজাহারুল ইসলাম	০২
কূজন	লিটন শব্দকর	০৩
যদি বলো	সীমা চক্রবর্তী	০৪
যাপন	রিয়া মিত্র	০৬
আমার বাড়ি	মধুমিতা রায়	০৭
জোনাকি জল্পনা	মেকাইল মন্ডল	০৮
ভুবনডাঙার পথে	যতীশ গোবিন্দ জানা	১০
লিমেরিক	মহঃ নিজামউদ্দিন	১১
মন খারাপ	আসলাম মন্ডল	১২
একটি মাঠের দুঃখ	শেখ নিয়ামত ইসলাম	১৩
পৃথিবীকে আর কিছু বলার নেই	সাবির আহমেদ হালদার	১৪
প্রতিকৃতি	ডলি শবনম	১৫
বৃষ্টি এলে	সুদীপ্ত বিশ্বাস	১৬
দূরত্ব	ধ্যানেশ	১৭
খোঁজখবর	দেবযানী ঘোষ	১৮
সাহিত্য	দ্বাদশ ব্যাক্তি	১৯
দোলা তোমাকে	রথীন পার্থ মন্ডল	২০
সাঁঝের আত্মকথন	শর্মিষ্ঠা গঙ্গোপাধ্যায়	২১
চলার পথে	প্রবীর শিকারী	২২
চাহিদা	সম্প্রীতি দে	২৩
ইছামতীর তীরে	অজয় ঋষিদাস	২৪
পরী-রাণীর অসুখ	গোবিন্দ মোদক	২৫
অপরাধী	ইব্রাহিম বিশ্বাস	২৬
"প্রিয় মানস কুমার গাঁয়েন স্যার"	মুহাম্মাদ ওলিদ সাঁফুই	২৭
"আমি"	সৌমিত সরকার	২৮
দুটি ছেলে	কৃষ্ণ চন্দ্র সরদার	৩০
নারীর স্বাধীনতা	সৌমিলি ঘোষ	৩১
কলমের টানে	প্রিয়া দাস	৩২
"মনুষ্যত্ব"	ভোলা মন্ডল	৩৩
স্মৃতি	তিথি	৩৪
স্বাধীনতা কোথায়	মনিরুল মন্ডল	৩৫

কালু	মৌমিতা ঘোষ	৩৬
যদি দেখতো	সম্রাট মৈত্র	৪০
জানুস ও জানুয়ারি	কাজরী পাত্র	৪৩
মন মাতাবে মাঙ্গা	অরণি সেনগুপ্ত	৪৫
শব্দ	শর্মিষ্ঠা গঙ্গোপাধ্যায়	৪৮
সরলরেখা ধরে	গোপেশ দে	৫২
কাগজ কুড়ানি	রঞ্জন ব্যানার্জী	৫৯

কমপিটে কলরব ৬৩

প্রাণের পরে

সুমনা ভট্টাচার্য্য

আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে…
বোঝার আগেই একটা তুখোড় দিন গিলে নিল আমাকে -
শিশিরের বিন্দুগুলো ঘামের মতো ছড়িয়ে পড়লো ত্বক জুড়ে,
কুয়াশা সূর্য্যের বল্লমে চিরে আগুনের মতো জ্বলে উঠলে
কানের কাছে ফিসফিস করে কেউ জানালো
আঁশটে নোনতা জল আকণ্ঠ চুবিয়ে রাখলেও
গহন শুদ্ধতা বিচারী…
প্রদীপ ভাসলেই খুঁজে নিই ধুপধুনোর আবহ -
ভোরের মতোই পায়ের ছাপ না ফেলে
উঠে যেতে চাই ক্ষণভঙ্গুরতার সিঁড়ি বেয়ে,
যযাতির বার্ধ্যকের মতো খসিয়ে ফেলতে চাই ক্ষয়িষ্ণুতা - অন্তহীন;
শেকড়ের মতো ছড়িয়ে যেতে যেতে
একসময় শেকড়ই ছিন্ন করে দেয় আমাকে-
বিশ্বাস করো এসময় আমি কান্নার মতো
দুগালে গান বিলিয়ে দিই -
এসময় আমি নিবিড় অদৃষ্টবাদী
এসময় আমি আদ্যন্ত মন্বন্তরবাদী …

নিজস্ব নিরালা

মহঃ আজাহারুল ইসলাম

ছুটেছি অবিরাম
দূর, অনেক দূরে
এই পরিচিত ভিড়
হাজারো শ্যাওলা জমা মুখের বিপরীতে ।
নিজস্ব নিরালায় প্রতিদিন উদযাপন করেছি
আপন শূণ্যতার হাহাকার
ধূলো ঝেড়ে তুলে রেখেছি
পুরোনো কবিতার ডায়েরি।
তোমার ঠিকানা ছুঁয়ে থাকা এই পথ
এই স্মৃতির শহর
আমাকে কোনদিন যেতে দিইনি
আমিও যেতে পারেনি
কিছুতেই যেতে পারেনি
এই সীমানার বাইরে ---
সমস্ত কষ্টের আগ্নেয়গিরি নিয়ে
পুড়েছি অহর্নিশি
ছড়িয়েছে আগুন হাওয়ার আদরে।

যে যেতে চায়
তাকে কি আটকানো যায়?
নদী যেমন ঠিক খুঁজে নেয়
নিজস্ব গতিপথ
নুড়ি, বালির ঘর.....

কূজন

লিটন শব্দকর

এখনো স্বপ্নময় ভোরে
জল কাটে সাদা রাজহাঁস,
শিশিরের ঘ্রাণে ঘ্রাণে
জাপটে রাখি ভিজে ঘাস।
শ্যাওলার গালিচায়
সব সুখ দূঃখ কবিতাপত্র,
সব আমি হয় পাখি
আমাদের হয় দিন ও রাত্র।

শুভেচ্ছা ও উৎসাহে

যদি বলো

সীমা চক্রবর্তী

যদি বলো, এখানেই থেমে যাবো আমি,
হৃদয়ের কাকচক্ষু সরোবরে
সাঁতরাবো না আর
এঁকে নেবো তপ্ত মরু - চর
কাজল হীন চোখের এপাড় ওপাড়।

যদি বলো, কষ্টগুলো কে চির নির্বাসন পাঠাবো,
দগদগে যন্ত্রণার কবিতা লিখবে না কলম আর
জ্যোৎস্নার মতো মিঠে নরম সুখ জড়িয়ে বুকে
জীর্ণ ক্যানভাসে জীবন্ত হোক
মন রাখা ভালোবাসার।

যদি বলো, বেয়াদব ইচ্ছেদের ছেঁটে দেবো ডানা
সব সাদা পালক মেঘের মতো ঝরিয়ে দেবো,
বিন্দু বিন্দু জমা রক্ত শুষে নেবে ঠোঁট
অবাধ্যতার নগরীতে হোক ধ্বংসাত্মক সন্ত্রাসী হানা।

যদি বলো, দূরত্ব টা রাখবো না আর আমাদের মাঝে,
মুখোমুখি...শুধু চোখে চোখে কথা হোক,
ভুলে যাবো আদিম মৃত্যু শোক।
আয়নার বিম্বে ছায়া - কায়ায় যতটা ফাঁক
আমাদের নিবিড়তাও ঠিক তেমনটাই থাক।

যদি বলো, কিছুটা ভালোবাসা এখনো বাকি. . .
তবে পুরনো ব্যথার ঘূণে রাখবো না ঢাকাঢাকি।

যখন প্রবল শীতে চাঁদ যায় গলে
নীল জ্যোৎস্না মরে সবুজের হলাহলে,
কিছু ক্ষণিকের আহ্লাদে
চিৎকারে জানাবো ঝুঁকে পরা বুড়ো পৃথিবীকে - - -
যা চেয়েছি... পেয়েছি তা এই অবেলায়,
ভানুমতীর খেলায়. . . . ,
অভিমান পুষে কত আর চুপ করে থাকি।

যাপন

রিয়া মিত্র

এক- একটা রাতে
ছাদের কার্নিসে বসে বৃষ্টি ঝরাই,
সাথে আরও কিছু পারিজাত;
কিছু অকালে ঝরে পড়া হলুদ পাতাও দিই ছড়িয়ে।
সেগুলো মেঘ ভেঙে ভেঙে পাড়ি দেয়
যুগ থেকে যুগান্তরের দিকে।
জলস্রোতে ভেসে যায় রাতজাগা গান;
কিছু না ভেবেই নেমে পড়ি একবুক জলে।
সাঁতরে বেড়াই সাদা পৃষ্ঠায়
কতগুলো নীল আঁচড় কেটে
ওটা তখনও;
হ্যাঁ, তখনও কেবল তোমার ছবিই দেখায়।

আমার বাড়ি

মধুমিতা রায়

আমার বাড়ির সঙ্গে চারটে পুকুর
শুধু, উত্তরের দিকে
জানালারা চেয়ে থাকে। পথিকের অপেক্ষায়
আজও। চেনা কোনো গান
আকাশে যাদের বাস। রাত জেগে বসে থাকা
মাঝে মাঝে ঝরে পড়ে
প্রেমিকার দাঁড়

এরকম চারিদিকে চারটি পুকুরের কথা
ভেসে ভেসে খুঁজে চলা কুল পাপ মান
সবটা অধরা তবু
আমার বাড়ির মধ্যে জল আর হাঁস।

জোনাকি জল্পনা

মেকাইল মন্ডল

আধুনিক, ভুলে গেছো জোনাকি,
শেষবার কবে দেখেছ তাকে শহরে?
কালকের মতো উজ্জ্বল সে স্মৃতি?
নাকি এই শহরের ইতিহাসের মতো পুরোনো?
হ্যাঁ ভুলে গেছো জোনাকিকে, অনেকদিন,
হারিয়ে ফেলেছ শহর থেকে, একেবারে।
হারিয়ে ফেলেছ মেঘের নীচে তারা ভরা তিমির,
হারিয়ে ফেলেছ বৈশাখী গরমে ক্রিসমাস সন্ধ্যা।

কিউবার বাতাসে সে রাতে ভীষণ আনন্দমেলা;
প্রজ্জ্বলিত আত্মারা মেতেছে আলোক লীলায়;
আঁধার শূন্যে যেন স্পেনীয় আগুনের জ্বলন্ত ছাই–
বোকা ইংরেজের তাই নগর গড়া হয়নি সেদিন;
সভ্যতা ভোলেনি সেই গ্লানি, কমেনি সেই ক্ষোভ?
শহর জুড়ে তাই কি প্রতিশোধ? উৎখাত তাই ভাসকীট?
লুপ্ত করেছ বন বাদার ঘাস জমি পুকুর পাড়;
নীড় নেই আর, জ্বলে না জোনাকি ডিম,
রঙিন আলোতে বিষ মিশিয়ে কেমন;
নতুন শিশু আর মেলেনি ডানা কোনোদিন।
বিক্ষিপ্ত করেছ প্রেমিক হৃদয়,
প্রেমিকাকে আর কখনো খুঁজে পায়নি সে;
উজ্জ্বল আলোকে, শহুরে দূষণে
হারিয়ে গেছে প্রেমিক- প্রেমিকা;
ভেঙে ওদের ঘর বেঁধেছ নাগরিক সংসার,
সংহার করেছ প্রতিদিন, সৎকার করনি তার।

তাই এক দুটো জোনাকি প্রতিদিনই মরছে দেখি–
অমাবস্যার অন্ধকার একটুও গাঢ় হয়না তাতে;
জ্যোৎস্নার আলো ক্ষয় হয়না একফোঁটা;
লন্ঠনের নীচে অন্ধকার বাড়েনি দেখলাম,
ল্যাম্প পোস্টের নীচেও কমতি হয়নি আলো।
শহরে পথিক কমে গেছে বড়,
গেঁয়ো পথিকের হাতে আজ বড়ো টর্চ,
তাই কারুর উদ্বেগ হয়না, মরছে জোনাকি মরুক।

ভুবনডাঙার পথে

যতীশ গোবিন্দ জানা

ভুবন ডাঙ্গার পথে হেটে যায় কোন সে বালক!
পাতার মুকুট প' রে গোঁজা তাতে পাখির পালক।

ডেকোনা ডেকোনা তাকে, হেঁটে যাক যায় যতদূর
উদাসী বাউল গানে সে বাঁশিতে তুলে নিক সুর।

কোপাই নদীর ধারে যখন সে থমকে দাঁড়াবে,
দু' পাশের বন বীথি ভালোবেসে দুহাত বাড়াবে।

দিগন্তের তাল বন হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকে
ঘরছাড়া সে বালক, কোন্ মন্ত্রে কে ভোলাবে তাকে

পাতার মুকুটে গুঁজে নীলকন্ঠ পাখির পালক,
ভুবন ডাঙার পথে হেঁটে যায় উদাসী বালক।

লিমেরিক

মহঃ নিজামউদ্দিন

(১)

হরদম O_2 ছাড়ে হাঁস আর গরু
এ বাত লিডার বোলা ম্যায় ক্যা করু?
চলেছে জাদুর খেল
এখানে সাইন্স ফেল
এবার প্রমাদ গোনো ভারতের তরু।

(২)

গণতন্ত্রের বয়স বেড়েছে, শিথিল হয়েছে পেশী
সেকুলারিজম ও মৃত্যু শয়নে, দিন তার শেষাশেষি
তাই দেখি আজ অবাক নেত্রে
অন্যায় আসে ন্যায় এর ক্ষেত্রে
আরো দেখে চলি আইনের চেয়ে আবেগের জোর বেশি।

(৩)

দিকে দিকে বাজলো আবার নির্বাচনের বাদ্য রে
সংসদীয় এই রীতি কার ভাঙার আছে সাধ্য রে?
নাড়ছে কড়া ভোট
ভোটার তোরা ওঠ
বোতাম টিপে সারতে হবে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ রে।

মন খারাপ

আসলাম মন্ডল

শহর জুড়ে বিষন্নতা, তোমার কেমন অভাব,
বুকের ভেতর ভীষন যা' তা' , আমার মনখারাপি স্বভাব !
কোথাও যেন তোমার বাস, যায়না তবু দেখা,
শহর ভরা মুখোশ ভীড়, তবুও কেমন একা!
দুপুর নামে চিলেকোঠায়, রাত্রি নামে চোখে,
রাত দুপুরে ঘুম নামেনা, মন পোড়ানো বুকে।
এই যে যখন তুমি ছিলে, কোভিড-হীন কোলাহলে,
সুযোগ বুঝে রোদ্দুর হতাম,
ছায়া দিতাম কৌশলে।
তখন কথার উপর কথা সাজানো,
মনের থাকে মন,
সম্পর্কে সব যুদ্ধ এলো, হৃদয় দ্বারে ড্রোন।
হাত ছাড়লো, মন ছাড়লো, তবু স্মৃতির বহর কেন?
আলোকবর্ষ দূরেই তুমি, মন সরেনা যেন।
এখনো শুধু শহর জুড়ে, তোমার ভীষণ অভাব,
বুকের ভেতর মহামারী, আমার মনখারাপি স্বভাব।

একটি মাঠের দুঃখ

শেখ নিয়ামত ইসলাম

আমার বক্ষ ফুঁড়ে বেদনাগুলো জন্ম নিচ্ছে ঘাস হয়ে
আমি ঢেকে যাচ্ছি গহীন অন্ধকারে
বাতাসে উড়ছেনা আমার তনুকণা
আমি ধীরে ধীরে মিশে যাবো আফ্রিকায়
আমি এখন একা, ভীষণ একা ।

একদিন--
আমাকে নিয়ে দলে দলে লড়াই করতো ওরা
আমি কোন দলের ,
এবেলা-ওবেলা ভাগাভাগি করে নিত অথবা,
পাশাপাশি টেনে দিতো সফেদ বর্ডার
চিৎকার, হই হুল্লোড়ে আঙিনা ভরপুর
সকাল বিকাল দুপুর
আজ শূন্য, একাকী, পড়ে রই ।

আর ওরা ?আমার বুকে ছটফটানির দল গুলো
ওরা যে আছে বন্দি
গিলে গিলে খাচ্ছে ওদের বৃদ্ধি
হেরে যাচ্ছে বিপদের কাছে আমার স্বজন
ভংয়কর শত্রু যন্ত্রটির নাম ফোন ।

পৃথিবীকে আর কিছু বলার নেই

সাবির আহম্মেদ হালদার

পৃথিবীকে বলব নাকো আজ
আমার পাশে এসে দাঁড়াও ।
আমি তো আছি শ্মশানের ছাই মেখে
মৃত্যু পথগামী বিমানের জানালায় ।
স্তব্ধ নিশ্বাসে খুঁজি নাকো কাউকে
আজ বেলাশেষের প্রত্যুষে ।
আছি বরং ওই নীল সীমান্তের বাইরে
সূর্যের প্রখর অন্ধকারে ।

পৃথিবীকে বলব নাকো আজ
রাতের গহনের হাহাকারে রক্ষা করো আমাকে ।
কবরের মাটিতেই আজ জ্বলছে প্রদীপ
ভেসে ওঠে আমার মুখের প্রতিচ্ছবি।
আমি আছি ঠিকই সূর্যহারা অরণ্যে
ক্ষুধার্ত পশুদের শিকারের মুখে ।
মহাসাগরের শেষ ঢেউ গুনে চলে
আমার শেষ মিনিটের হৃৎস্পন্দন ।

পৃথিবীকে বলব নাকো কিছু
ফেলে আসা চিঠিদের ঠিকানার খোঁজ ।
আমি আছি তোমার নাগালের বাইরে
সেখানেই অমাকে বড্ড ভালো মানাবে ।
দিনের শেষে আমার গলিত শবে
জমেছে শকুনের ভিড়।
তোমার চোখে কখনও পাইনি নিজেকে
তুমি অপরিচিত হয়েই রয়ে গেলে ছায়াপথে ॥

প্রতিকৃতি

ডলি শবনম

যতদূর চোখ যায়, তুমি দেখো
হলুদ সর্ষের ক্ষেত।
আমি দেখি, এ যেন প্রকৃতি কন্যার গায়ে হলুদ!
ছোট্ট সেই চারাগাছগুলো আজ পরিপূর্ণ,
মৌমাছি, প্রজাপতি তাকে ঘিরে উৎসবে মেতেছে।
সন্ধ্যার মৃদু বাতাস, ঠিক মায়ের আঁচলের মত,
তাদের কপাল ছুঁয়ে গেল।

পাখিদের কলরব জানান দেয়
এবার বিদায় নেওয়ার পালা!
মেঘের রাজ্যেও তোড়জোড় বেশ,
পশ্চিমের আকাশ দেখো, লাল বেনারসি জড়ায়!

আমার মেয়েটারও যে আঠারো পেরিয়ে গেল,
সেও ঠিক বাতাসের মতই
আমার বাড়িময় ছুটে বেড়ায়!

বৃষ্টি এলে

সুদীপ্ত বিশ্বাস

বৃষ্টি এলে বুকের ভিতর গোলাপ কুঁড়ি ফোটে
বৃষ্টি এলে মনটা বড় উদাস হয়ে ওঠে।
বৃষ্টি এলে শিউলিতলায়, ছাতিমগাছের ডালে
মনটা বড় কেমন করে বৃষ্টি-ঝরা কালে।
এখন তুমি অনেকদূরে না জানি কোনখানে,
ভিজছো কিংবা গুনগুনিয়ে সুর তুলেছো গানে।
তোমার গানের সেই সুরটাই বৃষ্টি হয়ে এসে
টাপুরটুপুর পড়ছে ঝরে মেঘকে ভালবেসে।
মেঘ বিরহী, কান্নাটা তার বৃষ্টি হয়ে ঝরে
তোমার বুঝি মেঘ দেখলেই আমায় মনে পড়ে?

দূরত্ব

ধ্যানেশ

দূরত্বটা একটা ' অভিশাপ' ।
আমার থেকে দূরত্বে চলে গেলেই. .
তুমি আর আমার থাকো না, তা জানি।
তুমি তখন হয়ে ওঠো-
মদিরায় ডুবে যাওয়া অন্য একটা মানুষ।
ভালোবাসার অহংকার কে মাড়িয়ে, ছিঁড়ে-
তুমি হয়ে ওঠো মাংসাশী গৃদ্ধ,
অন্য কারোর শরীর হতে তুমি খুঁটে খুঁটে খাও-
তার রূপ, রস, সৌন্দর্য আর মাংস।
নারীদের মধ্যে তোমার কোন পার্থক্য নেই,
রাজপথের প্রমোদ নগরীর গণিকাও
তোমার প্রেমিকা হয়ে ওঠে মদিরায় মত্ত হলে।
রাতের অন্ধকার আরো আরো গভীর হলে. . .
তোমার মধ্যে জেগে ওঠে হাজার অশ্বশক্তি
রক্তের অণুতে অণুতে আদিমতার ক্ষুধা জেগে ওঠে-
তুমি আপাদমস্তক চেটে খাও
যাকে তোমার সহজলভ্য মনে হয় তাকে।
তোমার কাছে অমাবস্যা পূর্ণিমা সব সমান
নর্দমার জলে ও তোমার পূর্ণতার আশ্বাস
অভিশপ্ত দূরত্বে তুমি এক খেলুড়ে মানুষ।।

খোঁজখবর

দেবযানী ঘোষ

কোলাঘাটের ইলিশ ভালো বোয়াঘাটার কই,
দেগঙ্গার সবজি ভালো বনগাঁর সেরা দই |
বর্ধমানের মিহিদানা মালদহের ওই আম ,
শক্তিগড়ের চমচম আর হলদিরামের জাম |
কল্পতরুর মাখা ছানা জ্যোতিসেরা ল্যাংচাই
মৌচাকের ওই রসমালাই মুখটা কেমন ভ্যাংচাই |
অর্পিতার জলযোগে লাইন খাবার জন্য
তেমাথানি রাস্তা জুড়ে লোকে লোকারণ্য |
ভোজপুরির ফুচকা ঘিরে রংবেরঙের মেলা
কোর্টের মাঠের ঘুঘনি রুটি দেখায় কতই খেলা |
মুখরোচক তেলে বজায় সন্ধে বেলায় লাইন
ঘুরুপদর আলুরচপের ঘাটতি হলেই ফাইন |
জয়নগরের মুয়া সেরা মুর্শিদাবাদের গুড়
সুগার ফ্রি মিষ্টি অশেষ (হৃদয়পুর) বাপির চানাচুর |
আমিনার মোগলাই টা গন্ধে মো মো করে
সিরাজের বিরিয়ানিতে মন যায় ভরে |
শ্যামবাজারের গোলবাড়ি মাংস কসাই নাম
পুরানোতে ক্ষয়নি সে মান তবু উচিত দাম |
শিয়ালদহের ভাতের হোটেল পাঁচ টাকায় ভরপেট
আসন পিঁড়ি কলার পাতায় হয়না মাথা হেট |
বড় বাজারে আজওদেখো লম্বা চায়ের নেশা
কোটিপতি বোনে গিয়েও ছাড়িনি সে পেশা !
হাওড়া এবং শিয়ালদহে দেখবে টি, টি মেলা
পকেট ভরে কাট মানিতে খোজঁখবরের খেলা |

সাহিত্য

দ্বাদশ ব্যাক্তি

সূতিকাগার থেকে শ্মশান ঘাট - ওরা খুব, খু-উ-ব তাড়াতাড়ি চলে যায়।
ভাবি ওদের বাঁচাবো, অমর করব - ভাবনাটাই সার।
কিলবিল করে, খিলখিল করে তারা আমিও হুজুগে নেচে ওঠে
ধূস সবার মতন শব্দ দিয়ে, হৃদয় দিয়ে ওদের বাঁধা, না হয় না, হয়ে
ওঠে না। কৈফিয়ৎ নয়, অজুহাত নয়, কারণটা কি, বুঝতেই
পারি না। এই তো, এই তো পুরনো বন্ধুকে হঠাৎ দেখি ওরা
জন্ম নিয়েছিল, হাসি-খুশীতে স্মৃতিকথাতে ওদের শরীর ও তৈরি
হয়েছিল। এসেই বসব ভাবলাম, কিন্তু এসে বসলাম না –
কেন, সেটাও জানি না। আবার সেদিন ওরা আসলো, যখন
শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা। মনে হল, এইবার হবে, হবেই।
তারপর বিজলী হাওয়া, ট্যাপে খসখস আওয়াজ, মশাদের
র‍্যাপ গান। রাতে গরম ফিরে এলো, আলো ফিরে এলো, কিন্তু
ওরা ফিরল না।

একটা কারণ পেয়েছি। মনে যখন ওরা আসে, তখন ওরা
শুধুই রূপ, রঙ, গন্ধ আর ভালোলাগা। খাতায় আনতে গেলেই
শব্দ চাই, তার মানে চাই, অভিধান চাই আবার ছন্দও চাই -
খালি চাই, চাই চাই। হঠাৎ ঊ কার ঈ কার ভুলভাল হওয়া
না চাই। ব্যাস বেচারাদের দফা গয়া - শৈশবে বয়বৃদ্ধ শিশুদের
যেমন হয় আর কি। তার চেয়ে ওরা মনেই থাক, মনের
খাতায় ওরা থাকে ভালো। বাইরে আনলেই; মনে হয়
সূতিকাগার থেকে শ্মশান ঘাট - ওরা খুব, খুউব তাড়াতাড়ি চলে যায়
ভাবি ওদের বাঁচাবো, অমর করব - ভাবনাটাই সার।

দোলা তোমাকে

রথীন পার্থ মণ্ডল

জানি কেবলই ব্যস্ততা তোমার, দোলা!
তবু গ্রীষ্মের শেষ রাত
আর শ্রাবণের মেঘ ভরা সন্ধ্যায়
একা একা বসে উদাস বাতাসে
কাঁচা হলুদরঙা আকাশ দেখতে দেখতে
কেন যে অতীত ছুটে আসে!
তোমার কোমল বিষুবরেখার ওপর
হাজার ঢেউ আছাড় দিতে দিতে
হারিয়ে ফেরে ঠিকানাহীন অনাবিল প্রান্তরে,
তোমার খোলা বুকের ওপর
নীলাকাশ আর বিন্দু বিন্দু জলকণা
অত্যাচার করে
সেই ঈষৎ টোল পড়া বুকে
হাজার ঢেউ উথাল পাতাল।

সাঁঝের আত্মকথন

শর্মিষ্ঠা গঙ্গোপাধ্যায়

গোধূলির শেষ আলোকে লেহন করে
নেমে আসে সন্ধ্যা- -
ধূসর রঙা আঁচল উড়িয়ে মাথার'পরে,
সমস্ত অন্ধকারকে ঠাঁই দেয়
আপন ঘোমটার অন্তরালে।
রজনীগন্ধার করুণ আর্তি সর্বাঙ্গে জড়িয়ে- -
অপরাধীর মতো মুখ লুকায়
রাতের অমানিশার ঘনান্ধকারে।
রাতের সমগ্র নিঃস্বতাকে বক্ষে ধারণ করে ও- -
হাসনুহানার গন্ধ মাখে জোছনা রাতে,
পরিণতি জেনে ও অসঙ্কোচে পাড়ি দেয়- -
এক অজানা বিপুল নিস্তব্ধতার দেশে।
কখনও বা তারাদের দরবারে গায় গান,
কাব্যগীতির দু'একটা পাতা সন্ধ্যারাগে মাখে,
দু'একজন সুখকবির রেশমি কলম
হয়তোবা ছায়ার মর্ম বুঝতে পারে।
তবু দিনের শেষে একাকী বেশে
যখন কপালে অস্তরবির টিপ এঁকে
হেলান দেয় দিনান্তের বেড়াটি ধরে- - -
তখন সদ্যজ্বলা প্রদীপ ই তার পথপ্রদর্শিকা।
এক মহাকাশ শীতল আঁধারের পথযাত্রী সে।
তবু নীলকণ্ঠী সন্ধ্যা বিবাগী বাতাসে স্নাত হয়ে
অপেক্ষায় বসে আঁধার শেষের নতুন ভোরের।
প্রথম রাতের নবতারাকে- -
রাতের জড়ত্ব থেকে রক্ষা করে- -
রাতের চৌকাঠ পেরিয়ে
উপহার দেয় পূব দিগন্তের নবভোর।

চলার পথে

প্রবীর শিকারী

জীবন মম তটিনী সম
স্রোতস্বিনী প্রবাহিণী
কভু বেগহীন ধীরতম।
সে রচে মোর জীবনী
চরৈবতিই লক্ষ্য মম
আমি রচি তার কাহিনি।
উৎস হতে মোহনা
চলন তাহার বক্রপথে
ভুল হয়না নিশানা।
বাধা বিঘ্নের দেহরথে
পাই বা খুঁজে ঠিকানা
চলি তারে লয়ে সাথে।
পথে আসে নানা বাধা
থেমে যাওয়া যে মানা
জীবন যে থাকেনা বাঁধা।
যদি জঞ্জাল দেয় হানা
তবু প্রান করেনা সোঁদা
মানে না কোনো বাহানা।
মিলে সে সাগর সনে
প্রকৃতি যে তার সহায়
তাই চলে আপন মনে।
কিন্তু আমি অসহায়
উন্মত্ত তাই প্রতিক্ষনে
সেথা পাই কিনা ঠাঁই।
সবাই করে তারে কলুষিত
অন্যের পাপ করে বহন
তবু পূন্য করে প্রতিনিয়ত।
মোর হৃদে চলে আর্ন্তদহন
মেকি মুখোশে মুখাবৃত
তাই ভেদাভেদের অনুরনন।

চাহিদা

সম্প্রীতি দে

কিচ্ছু লাগবেনা,
বিশ্বাস করো, আমাদের কিছুই লাগবেনা।
কানের দুল, চুলের ফুল,
পুতুল বাড়ি, খেলনা গাড়ি,
আমাদের কিচ্ছু লাগবেনা।
শুধু ভাঙা ফ্যাক্টরির পাশে বাঁশবাগানের শেষে,
মুখে কালো কাপড় বেঁধে দাঁড়িয়ে থেকোনা শমনের বেশে।
শুধু গোধূলির আঁধারে বার বার স্কুল থেকে ফেরার রাস্তায়,
অমন লিপশা লাগিয়ে দিওনা বুকের ওপর থেকে হাল্কা নেমে যাওয়া ওড়নায়।

কিচ্ছু লাগবেনা,
বিশ্বাস করো, আমাদের কিছুই লাগবেনা।
কৃষ্ণচূড়া, ফুলের তোড়া,
ভালোবাসা, সুখের আশা,
আমাদের কিচ্ছু লাগবেনা।
শুধু প্রত্যাখ্যানের আগুনে, উগ্র ফাগুনে,
দগ দগে লাল জ্বলন্ত ছাপ ফেলে যেওনা আমাদের মুখে ও মনে।
শুধু বারংবার শরীরের আসনে, চওড়া বেল্টের শাসনে,
নারী জন্মটাকে হারিয়ে যেতে দিওনা এক অভিশপ্ত কোণে।

কিচ্ছু লাগবেনা,
বিশ্বাস করো, আমাদের কিছুই লাগবেনা।
সোনার মালা, রুপোর বালা,
রেশমি চুরি, ঢাকাই শাড়ি,
আমাদের কিচ্ছু লাগবেনা।
শুধু গায়ের সামান্য মলিন কাপড় টা টেনে হিচড়ে,
আকাশে বিজয় পতাকা হিসেবে উড়িয়ে দিয়ো না ছিড়ে খুঁড়ে।
শুধু দিনের শেষে একটি বার মেয়ে মানুষকে মানুষ বলে ভাবতে শিখো,
আমাদেরও মন আছে, মান আছে, প্রাণ আছে,
শরীর কাটলে রক্ত আছে, একটিবার ভেবে দেখো।

ইছামতীর তীরে

অজয় ঋষিদাস

ইছামতীর তীরে বসে আছি ,
সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসা শোকের ছায়া দিয়ে ঘেরা আকাশের নীচে ;
আজ আমি সব কিছুর মাঝে নিঃসঙ্গতাকে খুঁজে পাই |
আজ চারিদিক যেন নীরব অন্ধকার :
এ জগৎ যে এতো নিষ্ঠুর- বাস্তব , একথা জানা ছিল ;
কিন্তু তার রূপকে কখনও দেখার সৌভাগ্য হয়নি আমার |
আজ কেন জানিনা এ নদীর বুকে এত আন্দোলন !
হয়তো বা আমার মতোই ----
তাকে কেউ আঘাত দিয়েছে |
আজ তার বয়ে চলার মাঝে কোনো ছন্দ নেই ;
নেই কোনো নব উদ্যম মেশানো উল্লাসের ভাষা |
তবুও তাকে বয়ে যেতে হবে ,
এই মহান বিশ্বের নিয়মের স্রোতের টানে ||

পরী- রাণীর অসুখ

গোবিন্দ মোদক

পরী- রাণীর জ্বর হয়েছে
তাই মুখটি সবার কালো --
কারও যেন কোনো কিছুই
লাগছে না তাই ভালো !

ডাক্তার আসে, বদ্দি আসে
আসে সব কবিরাজ --
ওষুধপত্রেই ঘর ভরেছে
বেড়েছে দাসীর কাজ !

তবুও জ্বর কমছে নাকো
বাড়ছে অসুস্থতা --
পাত্র- মিত্র খুঁজছে সবাই
কোথায় পাবে ত্রাতা !

এমন সময় দেবদূত এলো
নেমে আকাশ থেকে --
' তোমার কিছু হয়নি মাগো'
বলল রাণীকে দেখে !

মা ডাকটি শুনেই রাণী
সুস্থ হয়ে ওঠে --
আবার রাজ্যে সবার মুখে
স্বস্তি -হাসি ফোটে !!

অপরাধী

ইব্রাহিম বিশ্বাস

ছেলেটা সত্যিই অপরাধী ?
খুন, ধর্ষণ , ছিনতাই —কোনো কিছুই তো করেনি ।
কেবল জানালার কালো পর্দাটা একটু তুলে ধরে ছিল
কয়েকটা আলো কে আদিকখেতা করে
নেমন্তন্ন করে ছিল ।
বাতি জ্বালাবে , জানালার পর্দাটা সরিয়ে
দূরের শহরটাকে দেখবে —সে অধিকার কি আছে ?

হ্যাঁ, ছেলেটা অপরাধী
খিদে পেলে খাবে, প্রয়োজনে বাথরুমটা সেরে ঘুমিয়ে পড়বে । দরকারটা কি ?
মুখ আর মুখোশটাকে পৃথক করে দেখাবার ।

বাতাসে মানুষের মুখ থেকে কত শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে– দেশদ্রোহী, ফাঁসি, জেল, বন্দি
নিশ্চিত সেও বন্দি হবে, যে কোনো সময়
কিন্তু কখন —সেটা জানা নেই ।

' প্রিয় মানস কুমার গাঁয়েন স্যার "

মুহাম্মাদ ওলিদ সাঁফুই

প্রিয় স্যার, মুষ্টিমেয় কিছু সময়ের স্মৃতি,
আজও ভেসে ওঠে জীবনের অঙ্গারে।
রাঙিয়ে দেয় শীর্ণ বিদীর্ণ হৃদয়।
আবার টেমস্ এরমতো ধারায়িত করেচক্ষুযুগল।
সময়ের তুলি রেখে গেছে কত ধূসর রঙ,
হাসি কান্নার মিশ্রিত জীবনে, আজ ও
ছুয়ে থাকি সেই ধূসর রঙের ডালি।
জীবনের আয়নায় কত শত জ্ঞানী চোখ,
আপনাকে ভিন্ন ধরা পড়ে সে জগৎ টাতে।
যেন এক অন্য অনুভূতির চোখ আমি দেখি।
জীবনের সেই দু' টি বছর আপনাকে দেখেছি,
চিনেছি যেন হাজার হাজার বছর ধরে।
আমি আজ আগামীর দ্বার প্রান্তরে।
হেঁটে চলেছি আপনার বিদায়ী আশীর্বাদ নিয়ে।
অন্ত প্রেম কমেনি আজও আপনার তরে।
আজও এ জীবনে বহুবার উপলব্ধি করি
আপনার মত প্রিয় শিক্ষকের শূন্যতা।

" আমি"

সৌমিত সরকার

আমি আলোকে ভয় পাই
আমি জানি, কিছু পরেই আঁধার ঘনিয়ে আসবে
আমি অন্ধকার ভালোবাসি
আমি জানি, একদিন অন্ধকার কেটে যাবে
আমি আলোর পথের দিশারী হবো।

আমি সুখকে ভয় পাই
আমি জানি, সামনেই দুঃখ অপেক্ষা করে আছে
আমি দুঃখকে বরণ করে নিই
আমি জানি, দুঃখের শেষে সুখের বাতি জ্বলবেই
আমি সুখের দেশের পথিক হবো।

আমি ভালোবাসতে ভয় পাই
আমি জানি, ভালোবাসার পথে কাঁটা আছে
আমি ঘৃনাকে বরণ করে নিই
আমি জানি, একদিন সে আমায় বুঝবেই
সেদিন হয়তো আমি ভালোবাসার দেশে যাবো।

আমি ভালো শুনতে ভয় পাই
আমি জানি, একদিন সে আমার দোষ ধরবেই
আমি খারাপ শুনতে ভালোবাসি
আমি জানি, একদিন সে আমায় বুঝবেই
সেদিন আমি ভালোমানুষের দেশে যাবো।

আমি ধার্মিক —আমি দয়াল শুনতে ভয় পাই
আমি জানি, একদিন সে আমায় অধার্মিক বলবে
আমি অধার্মিক–আমি চন্ডাল শুনতে ভালোবাসি
আমি জানি, একদিন সে আমায় ধার্মিক বলবেই
সেদিন আমি দয়াল বেশে ধর্মের দেশে যাবো।

আমি অন্ধকার থেকে আলো
আমি দুঃখের মোড়কে সুখ
আমি ঘৃনার পাত্রে ভালোবাসা
আমি খারাপের বেশে ভালো
আমি সেই অধার্মিক যে ধর্মের পথ দেখায় ।

দুটি ছেলে

কৃষ্ণ চন্দ্র সরদার

ছেলেটির সঙ্গী ডাংগুলি ঘুড়ি
মাঠ ঘাট নদী পাখি ওড়া উড়ি ।
অভাবের তাড়নায় শাক পাতা খায়
স্কুল চৌকাঠের দিকে কে বা যায় ।
প্রকৃতির কোলে এলো যৌবন তার
কায়িক শ্রমে সে পাতে সংসার ।।
দম দেওয়া ঘড়ি আছে ছেলেটার
খেলনা কত গেম কম্পিউটার ।
দুধ ছানা কাজু লাগে না ভালো
নার্শারী কে জি কলেজ এলো ।
ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেল সে বিদেশ
বিদেশিনী বউ নিয়ে সংসার বেশ ।।
সংসার বেড়েছে বেড়েছে অভাব
সবার প্রতি নেই ভাবের অভাব ।
পড়শীর প্রতি টান মাটি তার মা
কাজের ফাঁকে গায় নি সা রে গা মা ।
জীবনের সুর চিনে জীবন কে দিয়ে
শিক্ষাহীন তবু সুখী সব নিয়ে ।।
ধীরে ধীরে জমে টাকা বাড়ি গাড়ি হয়
প্লেন কষে লাখ থেকে কোটি কেন নয় ?
মাতা-পিতা দেশ ছেড়ে না গেলে
চিনত না জীবনটা কাহাকে বলে ।
চিন্তাতে নেই তার ফাঁক একত্রিশ
সুখের শয্যা সঙ্গী স্লিপিং পিল ।।

নারীর স্বাধীনতা

সৌমিলি ঘোষ

নারী একদিন তুমি জেগে উঠেছিলে ,
লড়েছিলে গোটা অসুর কূলের সাথে।
তুমি সেই অসামান্য দুর্গতিনাশিনী মা,
যে এখনও জেগে আছে কোটি মানুষের রক্তের স্রোতে স্রোতে
সেই নারী তুমি যাকে কিনা সহ্য করতে হয় সমাজের লালসা,
আবার তুমিই সে যে পুত্রহীন মা বাবার একমাত্র ভরসা।
যার ছাত্র পড়ানো টাকায় দুবেলা পেট ভরে,
সমাজ আজ তাদের করছে ঘৃণা, তার শিকার করে. . . . .
আর কতদিন শোষণ হবে নিপীড়ন হবে আর হবে ধর্ষণ ?
প্রশাসনও আজ চুপ হয়ে আছে
শুধু শোনা যায় কিছু অসহায় জননীর ক্রন্দন ।
কিছুদিন হবে নীরবতা পালন আর মোমবাতির মিছিল
আবার সব থেমে যাবে একদিন
হয়ে যাবে দিনগুলি বিলীন।
তাই স্বাধীনতা চাই. . . . . . স্বাধীনতা. . . . .
আর থাকবে না নারী ঘরের গণ্ডিতে বাঁধা।
লড়বে তারা, গড়বে সমাজ, ছিড়বে ধর্ষকদের মুখোশ।
জয় হোক আজ তোমার নারী তুমিও পারবে ভাঙতে শক্তখোলস।

কলমের টানে

প্রিয়া দাস

ব্যস্ত সময়ের টানে ।
সুর বেঁধেছি গানে ॥
ব্যস্ত সময়ের ডাকে ।
ভুলেছি অতীতটাকে ॥
কলমের টানে লেখা হবে রোজ ।
এভাবেই পেতে পারো তুমি তার খোঁজ ॥
তুলির টানে শিল্পীর মান ।
সৃষ্টিতে বেঁচে থাকে তার সম্মান ॥
স্বপ্নগুলো থাকুক বেঁচে হৃদয়ের মাঝে ।
ইচ্ছেগুলো ডানা মেলে উড়ুক সকাল-সাঁঝে ॥
কলমের টানে স্বপ্ন হোক সত্যি ।
ইচ্ছে খুশিতে জীবন হোক ভর্তি ॥
কলম দিয়েই মনের কথা আমরা লিখে যাবো ।
সৃষ্টির মাঝে এভাবেই নিজেদের খুঁজে পাবো ।।

" মনুষ্যত্ব"

ভোলা মণ্ডল

আমরা কাকে শিক্ষা দেব
নিজেরাই শিক্ষা গ্রহণ করিনি যখন
সদা বলি অন্যকে, বিবেক দেখো
নিজেরা কখন দেখলাম বিবেক ?
যেখানে আমাদের বিবেক ঠিক নেই
তবে কি করে চরিত্র গড়া।
সর্বদা আমরা কি করি?
মানবতার জয়গান!
শুধু করি ধর্মের জয়গান . .
অর্থের জয়গান. . . .
আর সেখানে কি করে হয় চরিত্রগড়া
শুধু অর্থের লোভ লালসায়
গ্রাস করি সব. . .
কখনও গ্রাসের কোলে নারীও অপহরণ ,
তবে কোন শিক্ষা আমরা নেব আর দেবো,
নিজের বিবেক যেখানে ঠিক থাকে না।
বাহির জগতে নিজেকে মহান করে
মনের জগতে রাখলাম হিংস্র পশুর থাবা
তবে এই আমাদের কিসের মানবতা?
কিসের ' স্বাধীনতা' ?
কিসের ' মনুষ্যত্ব' ?

স্মৃতি

তিথি

কাটতে চাই না দিন
কাটতে চাই না রাত
বেদনা যে এতো কঠিন
বুঝলাম আমি আজ|

প্রতিদিন সূর্য ওঠে
সাঁঝের বেলায় চাঁদও
আমার কথা মনে পড়ে কী ?
বন্ধু তোমার আজও|
জানি তুমি তো ভুলেই গেছ
তোমার দেওয়া কথা
আমার কিন্তু মনে আছে
তোমার স্মৃতি কথা |

স্বাধীনতা কোথায়

মনিরুল মন্ডল

আজ অন্ধ হয়ে বসে আছি
দুই চোখে কালো পর্দা লাগিয়ে
অন্যায় সমানে হয়ে যাচ্ছে
বিচার করার কেউ নেই।
অন্যায় দেখছি আমরা তবুও
মুখ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছি আমরা সবাই।
গোলাম আগেও ছিলাম এখনো আছি
আগে ছিলাম রাজা রানীর গোলাম
তারপরে হলাম ইংরেজদের গোলাম
আর এখন হয়েছি টাকার গোলাম।
তবে গোলাম গোলামী থেকে গেলাম
স্বাধীনের স্বাদটুকু পেলাম না।।।

কালু

মৌমিতা ঘোষ

অফিস থেকে ফেরার সময় মাঝেমধ্যেই রিনির জন্যে কিছু না কিছু কিনে ফিরতাম আমি। রিনি আমার মেয়ে, আমার পৃথিবী। সারাদিন ওকে ছেড়ে থাকি বলে এমনিই মনটা খারাপ থাকে, কিছু একটা নিয়ে ফিরলে মনে হয় ও খুশি হবে। কর্মরতা মায়েদের আসলে মাঝেমধ্যে বড় অসহায় অনুভূত হয়।

যাই হোক, সেদিন ফেরার সময় নিয়ে ফিরলাম কালুকে। আমার অফিসের গাড়িটা যখন ধর্মতলার সিগন্যালে আটকে ছিল, তখনই একটা বাচ্চা ছেলে আমার গাড়ির জানলার কাছে এলো কালুকে নিয়ে। ওর হাতের ট্রে টাতে বিভিন্ন রঙের খেলনা কুকুর ছিল, কিন্তু আমার চোখ টা কালুর ওপরেই আটকে গেল যেন। কুচকুচে কালো রঙের কুকুরটা, চোখের মনি দুটো নীল। মাথাটা নাড়িয়ে চলেছে বসে বসে। একটাই মাত্র কালো কুকুর। রিনির এরকম খেলনা কুকুর আরো দুটো ছিল, একটা সাদা আর অন্যটা বাদামি। আমি ওদের নাম দিয়েছিলাম লালু আর ভুলু। সেজন্যে একে দেখেই মনের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠেছিল ' কালু' !

সেদিন বাড়ি ফেরার সাথে সাথেই অন্যান্য দিনের মতোই রিনি ঝাঁপিয়ে চলে এলো কোলে। আদরপালা সাঙ্গ হলে ব্যাগের মধ্যে থেকে বের করলাম কালুকে। রিনি তো মহা খুশি। লালু ভুলুর পাশে কালুকে বসিয়ে হাততালি দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো সে। আর কালুও মহানন্দে মাথা নাড়াতে লাগলো। বিঘত খানেক লম্বা এই মাথা নাড়া খেলনা কুকুরগুলো আজকাল খুব উঠেছে। অনেকসময়ই দেখতে পাই দোকানে। তবে কালুর মতো এরকম কুচকুচে কালো আর নীল মনির কুকুর বোধহয় একটাই তৈরী হয়েছিল। এরকম তো আগে দেখিনি !

আমার শাশুড়ি বললেন, ' ইস, এরকম বিচ্ছিরি দেখতে কুকুরটা কোথা থেকে আনলি রে!'

' কেন গো, কালো বলে কি মানুষ নয়? আই মিন কুকুর নয়? অত অছেদ্দা করো কেন? কালোর ওপর কি মিষ্টি দেখতে বলোতো কালুকে!' - বলে উঠলাম আমি।

' সে তুই যাই বল বাপু, এ কুকুরটাকে দেখেই কেমন যেন লাগছে ! কেমন যেন অপয়া মতন। '

রিনির দিকে চোখ পড়তেই দেখি সে মহানন্দে ততক্ষনে কালুকে কোলে তুলে নিয়ে কি যেন বলছে ওর নিজের ভাষায়।

রিনি বড় হচ্ছে আস্তে আস্তে। এখন গুটি গুটি পায়ে নিজে নিজে হেঁটে বেড়ায় সারা বাড়ি। সবসময় ওর ওপর নজর রাখা সম্ভব হয় না। আর সেদিনও ঠিক তাই হয়েছিল।

আমি অফিস থেকে ফিরে গেট টা খুলতেই গেটের আওয়াজ পেয়ে ' মাম্মাম' বলে তরতর করে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে এলো রিনি। আমার শাশুড়ি পিছন থেকে ডাকলেও তার তখন শোনার সময় নেই। আমি গেট দিয়ে ঢুকে উর্ধশ্বাসে ছুটেছি সিঁড়ির দিকে, মেয়েটা নামতে গেলে অবধারিত পড়বে। এখনো ওর ব্যালেন্স আসেনি ভালো মতন। আর ঠিক সেই সময় সিঁড়ির ওপর থেকে শুনলাম রিনির গলা, ' আমাকে এখন ছাড় কালু, মাম্মাম এসেছে তো, আমি মাম্মামের কাছে যাবো। কাল আবার তোর সাথে খেলবো'।

আমি ততক্ষনে ওপরে উঠে ওকে কোলে তুলে নিয়েছি, ' কি হয়েছে সোনামা, এই তো মাম্মাম এসে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে কেউ একা একা নামে? পড়ে যাবে তো বাবু।'

' দ্যাখো না মাম্মাম, কালু কিছুতেই নামতে দিচ্ছিল না আমায়। আমার জামাটা টেনে ধরেছিল।' রিনির কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। আসলে বাচ্চাদের কল্পনা আর বাস্তব জগতের ফারাকটা খুব কম। রিনি কালুকে খেলনার চেয়েও বন্ধু ভাবে বেশী। রাতে ও ঘুমিয়ে পড়লে আমি সারা বাড়িতে ছড়ানো ওর খেলনা তুলে রাখি। সেদিন খেলনা তুলতে গিয়ে দেখি কালুর গলা আর দেহের মাঝের ফাঁকটাতে রিনির সন্ধেবেলায় পরে থাকা ফ্রকের টুকরো আটকে। নিজের মনেই হাসলাম আমি। আমার ছোট্ট মেয়েটা এই ফ্রক আটকে যাওয়াটাকেই কালুর টেনে ধরা ভেবেছে। তবে মনে মনে আমি ধন্যবাদ দিলাম কালুকে। যদি রিনি সিঁড়ি দিয়ে একা একা নামতে যেত, তাহলে যে কি হত !

সেদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ প্রচন্ড কুকুরের ডাকে। মনে হচ্ছে যেন ঠিক আমাদের বাইরের ঘরেই কুকুর ডাকছে। কিন্তু আমাদের বাড়িতে কুকুর আসবে কোথা থেকে? তাহলে কি শুতে আসার আগে দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গেছিলাম? ভীষণ জোরে চেঁচাচ্ছে কুকুরটা। মনে হচ্ছে যেন কাউকে দেখে তেড়ে যাচ্ছে।

অঘোরে ঘুমোচ্ছিল রিনির বাবা, প্রবুদ্ধ। ধাক্কা মেরে জাগালাম ওকে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, প্রবুদ্ধ উঠতে উঠতে কুকুরের ডাক একদম বন্ধ হয়ে গেছে।

' ধ্যুত, কুকুর কোথা থেকে আসবে? স্বপ্ন দেখছিলে তুমি। ঘুমিয়ে পড়ো।' - এই বলে আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে ও।

আমি জানি যে আমি স্বপ্ন দেখিনি।

পরদিন সকালে উঠে দেখি আমাদের কোলাপসিবল গেটের তালাভাঙ্গা। চোর এসেছিল, কিন্তু সে ভেতরে ঢুকতে পারেনি। কোনো কারণে পালিয়েছে দরজা থেকেই।

রাতে শোনা কুকুরের ডাক, আর তারপর এই ভাঙ্গা তালা, এক অদ্ভুত অশান্তির মাঝে দাঁড় করিয়ে দিল আমাকে| আর ঠিক এই সময়ে পাশের বাড়ির সীমা বৌদি জানলা দিয়ে ডাকলো আমাকে, ' এই সুনন্দা, তোমরা কুকুর পুষলে নাকি?'

' না তো বৌদি, কেন বলুন তো?'

' কাল রাতে খুব কুকুর চেঁচাচ্ছিল| আমার যেন মনে হলো তোমাদের বাড়ি থেকেই| তাই জিজ্ঞেস করলাম আর কি!'

আমি সীমা বৌদিকে আর কিছু বললাম না| তবে নিশ্চিত হলাম একটা বিষয়ে, কুকুরের ডাক আমি একা শুনিনি|

ভীষণ জোরে সাইকেল চালায় রিনি| বারণ করলেও কথা শোনে না| আমি বারবার বারণ করেছিলাম ওকে সাইকেল কিনে দিতে, যা চঞ্চল মেয়ে ! কিন্তু প্রবুদ্ধ মেয়ে অন্ত প্রাণ ! মেয়ে যখন একবার মুখ ফুটে সাইকেলের শখ জানিয়েছে, তার বাবা সেটা আনবেই| আমার হাজার আপত্তি তাই ধোপে টেকেনি|

ক্লাস নাইনের রিনি দিনের বেশ অনেকটা সময়ই সাইকেল নিয়ে তাই ঘুরে বেড়ায়| আমাদের বাড়ির সামনেই বড় রাস্তা| অনর্গল বাস, গাড়ি, লরি যাচ্ছে| ভীষণ ভয় করে আমার তাই রিনির জন্যে|

সেদিন রিনির অংক কোচিং থেকে ফিরতে বেশ দেরি হচ্ছিলো| ও কোচিং-এর পর খুব একটা দেরি করে না| কিন্তু সেদিন সময় পেরিয়ে আধঘন্টা হয়ে যাওয়ার পরেও রিনির দেখা নেই| টেনশনে ফোন করলাম ওর কোচিং- এ, ক্লাস ঠিক সময়েই শেষ হয়েছে| কোথায় গেল তাহলে মেয়েটা ! বাড়ির শাড়িটা বদলে যে মুহূর্তে বেরোবো ভাবছি, ঠিক সেই সময়ে বাড়ি ঢুকল রিনি, সাইকেল টা হাঁটিয়ে নিয়ে, একটু খুঁড়িয়ে|

' কি হয়েছে রে রিনি? '

' ও কিছু না মা, রাস্তায় একটু পড়ে গেছিলাম, হাঁটুটা একটু কেটে গেছে| '

আমার গলায় টেনশন টের পেয়েই বোধহয় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল রিনি| কিন্তু তারপর আমি চেপে ধরতেই সব খুলে বলতে বাধ্য হয়| কোচিং থেকে ফেরার সময় আচমকাই বড় রাস্তায় টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যায় রিনি সাইকেল সমেত| পড়ে যাওয়ার আগে ও দেখেছিল একটু দূর থেকে প্রচন্ড বেগে একটা বাস আসছে| কিন্তু পড়ার মুহূর্তেই ও শুনতে পেল ওর থেকে বেশ খানিকটা দূরে ভীষণ জোরে ব্রেক কষল বাসটা| তবে রিনিকে দেখে যে বাসটা ব্রেক কষেনি সেটা ও বুঝেছিল| কারণ বাস ব্রেক কষার

পরের মুহূর্তেই রিনি পড়ে| ড্রাইভার বলেছিলেন কোত্থেকে একটা কালো কুকুর সেই মুহূর্তে বাসের সামনে চলে আসে, তাই উনি ব্রেক কষতে বাধ্য হন| কিন্তু রিনি বা ওখানে উপস্থিত বাকিরা কেউ কোনো কালো কুকুর দেখেনি| তবে সবাই কুকুরটাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়েছিল সেদিন, ও ছিল বলেই আমার রিনি প্রাণে বেঁচে গেল|

খবরটা শুনে বুকের ভেতরটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল আমার|

কথায় বলে মায়ের আশীর্বাদ থাকলে নাকি সন্তানকে কোনো বিপদ স্পর্শ করতে পারে না চট করে| তবে আমার রিনির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু আলাদা| আমার আশীর্বাদ ওকে বিপদ থেকে কতটা রক্ষা করতে পারবে জানিনা, তবে এটুকু জানি যে একজন সবসময় আছে ওর সাথে, যে ওকে সব বিপদ থেকে বাঁচাবে| সে হলো কালু|

হ্যাঁ, পরশু দিনের ঘটনার পর আমি নিশ্চিত হয়েছি যে কালুই রিনিকে আগলে রাখে সবরকম বিপদ থেকে| পরশু রিনিকে কলেজ থেকে ফেরার সময় একটা অন্ধকার রাস্তায় ঘিরে ধরে কতগুলো ছেলে| ওরা রিনিকে জোর করে বাইকে তুলে নিয়ে যেতে চায়| চিৎকার করেও কোনো সাহায্য মেলেনি| চারটে ছেলের শক্তির সঙ্গে পেরে উঠছিল না রিনি| আর ঠিক তখনই ওখানে কোত্থেকে আসে একটা কালো কুকুর| আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেয় ছেলেগুলোকে| দু' জন পালিয়ে গেলেও বাকি দু' জনকে পুলিশ ধরেছে| ওদের সূত্র ধরেই অন্য দু' জন ও হয়ত ধরা পড়বে শিগগির|

এই ঘটনাটা না ঘটলে হয়ত আমি এতটা নিশ্চিত হতে পারতাম না কালুর উপস্থিতি সম্পর্কে| এর আগে বহু প্রমান পেয়েছি, যাতে বোঝা যায় ও রক্ষা করেছে আমাদের পরিবারকে বহু বিপদ থেকে বহুদিন ধরে| কারণ সব ক্ষেত্রেই ঘটনাগুলোর সঙ্গে একটা কালো কুকুরের যোগ থাকতো, আর এগুলো হয়েছিল কালু আসার পর থেকেই|

আমার শাশুড়ির মুখে গল্প শুনেছি, আমার ঠাকুমা শাশুড়ির নাকি একটা পোষা কালো কুকুর ছিল, রাস্তার কুকুর, যাকে উনি সন্তানের মতো ভালোবাসতেন| আর সেও ভীষণ পায়ে পায়ে ঘুরত ঠাকুমার| বাড়ির পাহারাদার হয়ে গেছিলো সে, চোর ডাকাত ভয়ে আসত না। ঠাকুমা মারা যাওয়ার পরদিনই সে মারা যায়|

রিনি জন্মানোর পর সবাই বলে ওকে নাকি অবিকল আমার ঠাকুমা শাশুড়ির মতো দেখতে| আমি জানিনা কালু কে, যে ছেলেটার কাছ থেকে খেলনা কুকুরটা কিনেছিলাম, তাকেও আর কোনোদিন দেখতে পাইনি ওই। সিগন্যালে| হতে পারে কালু হয়ত তার ' মা' কে পাহারা দিতে এসেছে| আবার এটাও হতে পারে যে এগুলো সবই আমাদের মনের কল্পনা| তবে আমি বিশ্বাস করি যে কালু আমাদের জীবনে আশীর্বাদ, ও কালো বলে অপয়া নয়|

যদি দেখতো

সম্রাট মৈত্র

আহ্, আহা! একটু থেমেই, জিতে গেছি, জিতে গেছি করতে করতে মাথার উপর হাত তুলে ঝাঁকাতে লাগলেন বাবলু বাগচি। টিভির পর্দায় রাহানে রোহিত পুজারা পন্থে গাব্বায় অজিদের আক্কেল গুড়ুমের উল্লাস। চারপাশের পৃথিবীটা চকচকে চোখে দেখে নিলেন বাবলু বাগচি। দূরের ঘরে এক খুদে অনলাইনে ক্লাস করছে। বিরক্ত মনে মাউস নাড়ছে। মাঝেমধ্যেই ক্যামেরা অফ অন করছে। ওইতো তার বহুকালের গিন্নী ওবেলার রুটি করে রাখছে। তাদের বাবু প্রৌঢ়ত্বের দরজায় দাঁড়িয়ে সাংসারিক আয়ব্যয় নিয়ে সকাল থেকেই হিসেব করে চলেছে। মধ্যে মধ্যে মোবাইলে স্কোর দেখেছে ঠিকই কিন্তু অজিঙ্কের আউটটার পর আপডেট নেয়নি আর। বাগচি বলতে যাবেন ভেবেও... আজ আবার বৌমার - ও শরীরটা ঠিক নেই। স্বভাববশত যাচ্ছিলেন বলতে' মা রে, চেতেশ্বর যেমন মার খেয়েও লড়ে গেল, তার থেকেই সাহস নিয়ে তুই... নাহ্ বলা হল না। বাড়ির অন্যদের অনেকদিন হল ন্যাতানো বিস্কুটের হাল হয়েছে। আগেরদিন হলে বাগচি সবাইকে অশ্বিন-বিহারীর যুগলবন্দীটা বারেবার মনে করিয়ে চাঙ্গা করে দিতেন। যেমন করেছিলেন রাহুল-লক্ষণের ইডেন টেস্ট নিয়ে। সেসময়ের পারিবারিক সংকট তো ওই রসদেই ডেড ব্যাট করে দেওয়া গিয়েছিল। আরেকবার এপাশ ওপাশ বাগচি খুঁজলেন তাদের যারা এই ঘরটাকেই মাঠ বানিয়ে মেতে উঠত। এমন প্রান জুড়ানো অজি সংহার দেখলে তারা কি করত আজ্! অতিমারী পর্বের নিদানমাফিক ভারতীয় দল বর্ডার -গাভাসকার ট্রফি নিজেরাই যখন হাতে তুলে নিচ্ছে, ঠিক তখন পরম আবেগে চোখ বুজে তাদেরকে খুঁজতে চাইলেন বাবলু বাগচি।

এমন জয়জয়কার হলে পেন কাগজ বাগিয়ে বসে পড়তেন যেমন তেমনি কিভাবে যেন শুরু করে দিলেন। লেখাটাও মেজাজ বুঝে সঙ্গ নিল...

"সকাল সাড়ে সাতটায় লাঞ্চ ব্রিসবেনে। পারলে সুশান্তদা-ধেন্দুদাও তখনই জলখাবার ও দুপুরের পাট চুকিয়ে ফেলেন। পুরনো অভ্যাসে কম্বল ও অ্যালার্মকে হারিয়ে ভোর পাঁচটাতেই টিভি ছেড়েছেন। চাদর ছুঁড়ে ফেলেছেন রোহিতের খোঁচাটা পেইনের ঝাঁপানো দস্তানায় জমতেই। সেজদা ফুট কেটেছেন পরিচিত আশঙ্কায়" হাঁটু কাঁপে ক্যান?" এসব পোড় খাওয়া দর্শকরা জানেন গাব্বার তেত্রিশ বছরের অপরাজেয় গরিমা। তাতে কামিন্স-হ্যাজেলউড-স্টার্কের আগুনে পেস ত্রিভূজ। রয়েছে পঞ্চম দিনের ফুটিফাটা পিচের ফায়দা লুটতে তৈরী শততম টেস্ট খেলতে নামা নেথান

লিঁয়। তাহলে কচিদাসোনাদারা সবাই শীতের সকালে খাটে, চৌকি, চেয়ারে কেন? আসলে সিরিজটাই যে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। ৩৬ রানে অল আউট থেকে মেলবোর্নে জিত, তারপর সিডনির ময়দানে সেই চোয়ালচাপা ব্লকব্লকাব্লক যা ড্রকেই বিজয়ের যে বড় করে: পাপুয়া, বাবাই, গোবিন্দ, বুড়ি বিস্ফারিত হয়ে দেখতে দেখতে শিখে নিয়েছিল মার খাব তবু মরব না মেজাজেও মর্যাদা আছে। বুড়োদা ইংরেজির প্রফেসর, তাই ক্রিকেটটাও বোঝেন। তিনিও বলে ফেলেছিলেন "ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি-র সান্তিয়াগো মনে পড়ে যাচ্ছে হে!"

অজিদের দুর্ভেদ্য দুর্গে নামার আগেই তো ভারত প্রথম একাদশের নজন খুইয়েছে। বলে মাত্র দু টেস্টের পুঁজি নিয়েই কি নেতৃত্বটাই না দিল মহম্মদ সিরাজ। আদর করে ফুলকাকা তো ডাকতেই লেগেছে" আমাগো সিরাজদোল্লা!" ক্রিকেটসাইক্লোপিডিয়া অঞ্জন মুগ্ধতা ঝরিয়েছে- বাবা মারা গেলেও সিরাজ দেশে ফেরেনি। নটরাজন ফোনেই সন্তানকে দেখেছে কেবল। ভাবা যায়! এরমধ্যেই কাপড় কাচার ব্যাট নিয়ে এক চক্কর ঘুরে গেল ভালোপিসি- আমি জানি ওই শুভগিল ছেলেটা বেদম খেলে। দ্যাখ ওই জিতিয়ে দেবে। নস্যি জোরসে টেনে পাল্টা দিল ভালোপিসে- হ্যাঁ গা, সে ৯১ করে তাঁবুতে বুঝলে।

মাটি বসেই টিভি দেখে বরাবর স্বপন টেলার। সেখান থেকেই বলে উঠল- বড়দা, বড়দা, পুজারা আসসলে দ্রাবিড়বংশের লোক। হাতেমুখেমাথায় কামিন্সের গোলাগুলো খেয়েও আবার গার্ড নিচ্ছে দ্যাখেন, দ্যাখেন। চকিতে পাপুয়ার মনে পড়েছিল ২০০৩ এর অ্যাডিলেড। রাহুল ভেজা চোখে যখন বলেছিল- এই জন্যই যে খেলি, সে কথা বিড়বিড়িয়েই তো সেবার বিসিএস প্রিলি না পেয়ে আবার গার্ড নিয়েছিল। অন্যদিকে স্টেপ আউট করে লিঁয়কে গ্যালারি রাহানে ফেলতেই ধেন্দুদা দিল হুংকার- আয় লড়বি! কিন্তু কোথায় কি! কামিন্স ভারত অধিনায়কের দৃপ্ত ইনিংসে দাঁড়ি টেনে দিল। রাজা ফিসফিসিয়ে বলল - কোহলি থাকলে! গোলুমোলু ঋষভ পন্থ কে দু বলের খদ্দের বলে গোমড়ামুখো হল বাবাইদা। আসলে ও ঋদ্ধিভক্ত। ওকে ভুল প্রমাণ করবে বলেই পন্থ যেন পুজারাপন্থী হল। মাঝে একবার স্টাম্প করার সুযোগ গলাল অজি দলনেতা। 'পেইন ইজ আ পেরপেচুয়াল পেইন অন দ্য অজি ব্যাকসাইড' , যথারীতি বুড়োদা বচন। ইতিমধ্যে পন্থ চেনা পথে। বল ওড়াচ্ছে। গাব্বার গালিচায় সবুজ মেখে সীমানা পার করছে। ছেলেটার খাঁচা আছে রে- চোঁ করে চা গিলেই মাণিকদা চেঁচিয়ে উঠল। বাবাইদা এবার চুপ। অবিশ্বাস আর আনন্দ মুখে কাটাকুটি খেলছে। ঘরের বাতাসে চা বিরতির পর থেকেই কেমন তিরাশিপঁচাশি গন্ধ। অঞ্জনদা কেঁপে বলে উঠল- সেই অষ্ট আশির ক্যারিবিয়ানদের পর. . . . যাঃ ডি আর এসে কামিন্স নতুন বলে সব চুরমার করে দিল! পুজারা এল বি! সেজদা

হাহাকার ছাড়ল- সেই এভাবেই ফিরে যাব শুধু স্বপ্ন দেখেই! মায়াঙ্ক আগরওয়াল ও টিঁকল না। এরপর. . .

হঠাৎ তোলপাড়িয়ে উঠল যেন পাড়া! পন্থ মারমার করে মরিয়া! ' দেখ, দেখ এই হল অকুতোভয়' ! বড়বৌদিও দাঁড়িয়ে গেছে দেখতে। সঙ্গে সুন্দর ওয়াশিংটন। জীবনের অভিষক ম্যাচে সম্মোহিত করেই চলেছে। ' গুরু, গুরু' - বলে লাফ দিল কচিকাকা! ' কি দেখলাম, সোনা সোনা' করে তার পাশে স্বপনখুড়ো। কামিন্সকে হুক করে একবার ছয়, পরের বলেই থার্ড ম্যান দিয়ে আপার কাটে চার। এ যে জর্জ ওয়াশিংটন, একেবারে ভয়ঙ্কর সুন্দর- ধেন্দুদা সটান ক্যাপশনে। ঋষভ তখন তুরীয় মেজাজে যা বাবাইদাকে দিয়েই গাইয়েই দিল- " পন্থী হু ম্যায়. . . " ! তীরে এসে সুন্দর, শার্দুল ফিরলেও, পন্থ অটল। তারপর গোলুমলুর শটটা তিন রান বাকি থাকতে চার হতেই. . . . "

গলা ধরে গেছে! এত জোর চেঁচালে যা হয় আর কি। বাবলু বাগচি লেখা থামিয়ে কখন ওই জগতেই মিশে গিয়েছিলেন বুঝতেই পারেননি। টিভিও বন্ধ হয়ে গেছে। যেমন অনেকদিন আগেই বাইশ গজের ভালোবাসা কাটিয়ে কোন নন্দনকাননে চলে গেছেন সুশান্তদা, ধেন্দুদা, সেজদা, বুড়োদা, ভালোপিসী- পিসে স- বা- ই! স্বপনখুড়ো কোভিড সারিয়ে বাড়িতেই। সোনাকাকা, কচিকাকা, মানিককাকা জয়ের সময়ে অদ্ভূতভাবে টিভির সামনে চলে এসেছিল। সেই আনন্দটা কি করতে পারল! বাবাইদা গাইত না- " জব দর্দ নেহি থা সিনেমে. . . ! " অঞ্জন অফিসে। খেলা ওই হাইলাইটসে দেখবে। তাহলে কাকে বোঝাবে, কাকে জানাবে এটা খেলা নয়, বিশ্বদা যেমন বলত" সারা জীবনের রসদ" ! তাদের যে এমন জয়ের পর বেঁচে থাকার সব কিছু সহজ হয়ে গেছে মনে হত। এখন আর তেমন হয় না বুঝি? তখনই বাবলু বাগচির চোখ পড়ল টিভির উপর তার শুকনো মালা পরা ছবিটার দিকে। তাহলে তার- ও কি এখানে থাকার কথা. . . আনল কে? টানল কে? সত্যি, ক্রিকেট মানেই মহান অনিশ্চয়তা! জানল আবার গাব্বা। জানা কথা মিলে যাওয়ার তৃপ্তি নিয়ে অনন্ত বাইশ গজে মিলিয়ে গেল এক আবহমান দর্শক!

জানুস ও জানুয়ারি

কাজরী পাত্র

নিউ ইয়ার বললেই বেশ কয়েকটা শব্দ মাথায় ভিড় করে আসে: কেক কাটা, আলো জ্বালা, বাজি ফাটানো, নতুন ক্লাসে ওঠা, আরো একবছর বড় হওয়া, আর হ্যাঁ, অবশ্যই রোমান ক্যালেন্ডারের প্রথম মাস, জানুয়ারি। জানুয়ারি মাস দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন দুটি বছরের ঠিক মাঝে, পুরনো বছরের শেষে আর নতুন বছরের শুরুতে। ঠিক যেমনটি রোমান পুরাণে বর্ণিত জানুস থাকেন। জানুয়ারি কথাটার অর্থ জানুসের মাস, বা, মান্থ অফ জানুস। কিন্তু জানুস কে এবং নতুন বছরের সাথে তাঁর সম্পর্কই বা কি?

জানুস হলেন গড অফ ডোর' স, এক কথায় দৌবারিক দেবতা। মাউন্ট অলিম্পাসে দেবতাদের বাসস্থানের দরজার গোড়া পেরোতে হলে তাঁর সাথে মোলাকাত হয়ে যায়, ঠিক যেমন পুরনো থেকে নতুন বছরে পদার্পণ করতে গেলে জানুয়ারি মাস পেরোতে হয়। জানুসের মত জানুয়ারিও হলো নতুন বছরের দৌবারিক।

মানুষের আরেক নাম হল ডিয়ম ড্যিও, বা দেবতাদের উর্ধ্বে যেই দেবতা, কারণ অলিম্পাসের প্রাচীনতম দেবতাদের মধ্যে একজন হলেন জানুস। জানুসের চেহারার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর দুই মুখ, অর্থাৎ একই মাথার দুই প্রান্তে দুটি মুখ: একটি মুখ চেয়ে থাকে দরজার বাইরে, আরেকটি ভেতরে। আপাতভাবে মনে হতেই পারে, দৌবারিক হবার পক্ষে আদর্শ চেহারা বর্ণনার জন্যই তার দুই মুখ এবং দু' জোড়া নজর, কিন্তু রোমান পুরাণ, ঠিক আমাদের হিন্দু পুরাণের মতই, যথেষ্ট গভীর এবং তাৎপর্যপূর্ণ। জানুসের একটি মুখ বৃদ্ধের মত এবং অপরটি এক তরুণের মুখ। ফলত্ একটির অর্থ বার্ধক্য, এবং আরেকটির তারুণ্য, যে বছরটি শেষ হয়ে, গেছে বা যে দরজা পেরিয়ে আসা হয়ে গেছে, সেটির প্রতীক বার্ধক্য এবং যে নতুন বছর, নতুন অভিজ্ঞতার মধ্যে আমরা প্রবেশ করতে চলেছি তার প্রতীক হলো তরুণ মুখ।
জানুস একই সাথে অতীত এবং ভবিষ্যৎ দেখতে পারেন, ঠিক যেভাবে সমস্ত মানুষকে অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান অর্জন করে ভবিষ্যৎ-মুখী হতে হবে।

স্বর্গ এবং মর্ত্যের ঠিক সীমানায় দাঁড়িয়ে থাকেন জানুস। জানুসের অতীত সম্পর্কে পুরাণে খুব আবছা এবং বিক্ষিপ্ত আভাস রয়েছে। রোমান এবং গ্রিক পুরাণে মর্টাল, অর্থাৎ যাঁরা নশ্বর, তাঁরাও তাঁদের মহৎ কাজের ফলে দেবতার পদে উন্নীত হতে

পারেন। জানুস ছিলেন খুব সম্ভবত এরকমই এক মর্টাল, যাঁর জন্ম হয় থেসালি' তে। পরে কামিস' কে বিবাহ করে তিনি ল্যাটিয়ামের সহ শাসক হন। জানুস এবং কামিসের রাজত্বকালে ল্যাটিয়ামে ছিল স্বর্ণযুগ: অফুরন্ত কৃষিকার্য এবং ধন-দৌলত ছিল প্রজাদের কাছে। কামিসের মৃত্যুর পর জানুস আরো অনেক বছর শান্তিতে রাজত্ব করেন।

নুমা, রোমের দ্বিতীয় রাজা, জানুসের মন্দির তৈরি করেন। সেই মন্দিরের ছিল দুটি দ্বার। একটি পূর্ব দিকে, যেখান থেকে সূর্যোদয় দেখা যেত, আরেকটি পশ্চিমে, সূর্যাস্তের মুখোমুখি। যুদ্ধ চলাকালীন মন্দিরের দুই দ্বার খোলা থাকতো, যাতে দেবতা স্বয়ং নেমে তাঁর উপাসকদের রক্ষা করতে পারেন (রোমান এবং গ্রিক পুরাণে দেবতারা হামেশাই মর্তে নেমে মানুষের সাথে মিলে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন এবং করাতেন) এবং দেশে শান্তি থাকাকালীন মন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকতো। কথিত আছে রাজা নুমার রাজত্বকাল থেকে রাজা অগাস্টাসের রাজত্বকাল অব্দি প্রায় সাতশো বছরে মন্দিরের দ্বার মাত্র একবারের জন্য বন্ধ ছিল।

সমস্ত কিছুর শুরুর দেবতা হলেন জানুস। যেকোনো দেবতার অর্চনা করার আগে রোমানরা জানুসের স্তুতি দিয়ে আরম্ভ করতো। রোমানদের নানান রকম আচার অনুষ্ঠানে, যেগুলো কোন সূচনা বা বিজ্ঞাপনের জন্য পালিত হতো, জানুসকে স্মরণ করা হতো: বিবাহ কিংবা শেষকৃত্য, জন্ম কিংবা প্রথম ফসল ফলার পর। রোমানরা যুদ্ধযাত্রা করার সময় জানুসের মূর্তি খচিত দরজা, বা "জানি", দিয়ে বেরিয়ে পড়ত। তাই এই জানুয়ারিতেই শুরু হোক আবার নতুন পথে যাত্রা, নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং রোমানদের মত "জানি" না হলেও, জীবনের বহু নতুন দরজা খুলে ফেলা।

মন মাতাবে মাঙ্গা

অরণি সেনগুপ্ত

কমিকস কি, সেটা আমরা সবাই জানি। ইংরেজি তে টিনটিন অথবা আস্তেরিস্ক এবং বাংলা তে নন্টে ফন্টে , হাদা ভোদা ও বাঁটুল দি গ্রেট কমবেশি সবারই পড়া। যেকোনো সাহিত্যের মতোই কমিক্স ও পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের পাওয়া যায়। সেই রকমই এক ধরন হল জাপান দেশের 'Manga' কমিক্স। Doraemon এর কথা তো আমরা সবাই জানি, এই Doraemon ও কিন্তু প্রথমে ছিল একটি manga কমিক, সেই Doraemon manga কে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে আমাদের সবার প্রিয় Doraemon কার্টুন টি।

Manga প্রকাশনের পদ্ধতি কিন্তু আমাদের চেনা পদ্ধতি র থেকে একটু আলাদা। Manga প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন এ (Shounen jump অন্যতম) একটি চ্যাপ্টার করে। এই format এ প্রকাশনের ফলে, সমস্যা সৃষ্টি হয় একটি। একসাথে ২০ টি আলাদা গল্পের চ্যাপ্টার এর বন্যা এ, আগের সপ্তাহে একটি কোন গল্পে কি ঘটেছিল সেটি মনে রাখা টা মুশকিল হয়ে পড়ে। এই কারণে mangaka (manga র লেখক এবং প্রধান চিত্রকর) ক্রমশই চেষ্টা চালিয়ে যান যাতে পাঠক আগের ঘটনা না ভুলে যায়। কি ভাবে? না , এমন সব ঘটনা ঘটিয়ে যা পাঠক কে বিশিত্ত এবং উত্তেজিত করে তোলে, যার ফলে এক সপ্তাহ কেটে গেলেও সেই ঘটনার রেশ থেকে যায় পাঠক এর মনে। এই পদ্ধতি তে এক তীরে দুই পাখি ও করে, যে পাঠক আগে ওই গল্পের কথা শোনেনি সেও এই গল্পের প্রতি আকর্ষিত হয়ে পড়ে। এ ছাড়াও আরেকটি পদ্ধতি হলো সহজ ভাবে মনে করিয়ে দেওয়া আগের ঘটনা, সেটি প্রথম দুটি পেজ এ কেবল flashbacks এর দ্বারা, অথবা দুটি চরিত্রের মধ্যেকার dialogue এর মধ্যে দিয়ে। কিন্তু সমস্যা আছে এতেও। কি সমস্যা? না যখন একটি গল্প বেশ বড় একটা পাঠক সংখ্যা লাভ করে তখন সেটি Volume basis এ প্রকাশিত হতে থাকে magazine এর সঙ্গে সঙ্গে। এই কারণে যে পাঠক ম্যাগাজিন না পড়ে Volume পড়ে সে চট জলদি বিরক্তি বোধ করতে পারে ক্রমশ flashback এবং repeat dialogue এর ঠ্যালা তে, কাজেই সে দিকটাও নজর রাখতে হয় mangaka কে।

আরো একটি মজার ব্যাপার বলি, কোনো manga যখন শুরু হয়, তখন কিন্তু ঠিক থাকে না যে সেই manga কতদিন, কত chapter পর শেষ হবে, বা আদৌ শেষ হবে কিনা। কেনো? না প্রত্যেক manga ই নির্ভর করে তার পাঠক সংখ্যা র ওপর, যে মুহূর্তে পাঠক সংখ্যা কমে যায়, সেই মুহূর্তে প্রকাশক রা সেই manga র প্রকাশন থামিয়ে দেয়। যার কারণে mangaka কে ক্রমশ তার পাঠক সংখ্যা বজায় রাখতে হয়, যার কারণে plot twist এর ব্যবহার খুবই লক্ষণীয় প্রচুর manga এ। এই ক্ষেত্রে সমস্যা ও থাকে প্রচুর, এবং এমন দেখাই যায় যে কোনো লেখক লিখতে না পেরে দীর্ঘ দিনের জন্যে hiatus (লেখা থেকে বিরতি) নিচ্ছেন। এর প্রধান নমুনা, Hunter x Hunter এর mangaka যিনি দীর্ঘ ৮ বছর এর hiatus e আছেন এবং এর আগেও ছিলেন।

এবার আসছি আমার প্রিয় দুজন mangaka র কথা বলতে

প্রথম, Hirohiko araki অথবা Araki sensei।

ইনি হলেন Jojo no kimyou no bouken অথবা JoJo's bizzare adventure এর mangaka, এই manga চলছে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে, এবং এখনও শেষ হওয়ার কোনো চিহ্ন না দেখিয়ে।

কি করে Araki এমন করলেন? এর একটাই উত্তর, নতুনত্ব।

Araki যখন লেখা শুরু করেন তখন manga জগৎ এ ভীষণ ভাবে প্রচলিত ছিল cyber punk genre টি। সেই cyber punk থেকে বেরিয়ে Araki লিখতে শুরু করলেন একটি manga যার গল্প কিনা নিয়ে চলে আমাদের খাস England এ একটি ব্যবসায়ী র বাড়িতে। এর পরেও তিনি কোনো এক জায়গায় না থেকে দেখিয়েছেন পুরো বিশ্ব, Egypt, China, America থেকে আমাদের নিজেদের কোলকাতা সবই রয়েছে এই manga এ। এ ছাড়াও আরেক মজা, কি? না তার একটি প্রধান চরিত্র বলে কিছু নেই, আছে কিনা একটি প্রধান বংশ, Joestar বংশ। এই বংশের বিভিন্ন সদস্য কে কেন্দ্র করেই তৈরি করেন তিনি বিভিন্ন part, বিভিন্ন সময় ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন নতুন চরিত্রের মাঝে।

এবার আসি আমার সবচেয়ে প্রিয় mangaka র কথায়।

Hajime Isayama sensei, Shingeki no kyojin/Attack on Titan এর mangaka।

এই Isayama, দীর্ঘ ২ বছর ধরে একটি গল্প তৈরি করেন, এবং সেটি প্রকাশনের জন্যে যায় একটি প্রকাশনী র কাছে।

এই manga র মজা কোথায়? না এর জগৎ এ, চলতি ভাষায় যা বলা হয় world building। তিনি এমন ভাবে তার পুরো গল্প টি তৈরি করেন যে পাঠক দের যা বলা হচ্ছে সেগুলো সত্য মনে হলেও আদপেই সত্য নয়। এমন অনেক ঘটনা ঘটে এই manga তে যা থেকে পাঠক দের অতীত বিশ্বাস গুলো দুমড়ে মুচড়ে চুরমার হয়ে যায়, এবং এক সময় গিয়ে পাঠক কোন টা ঠিক কোনটা ভুল, কে ঠিক কে ভুল, এবং ঠিক কি, ভুল কি সেই চিন্তা এ পড়ে যায়। এর কারণে আগামী যে ঘটনা তা আরো অবিশ্বাস্য এবং অবিশ্বাস যোগ্য হয় ওঠে যার কারণে একটি অদ্ভুত situation তৈরি হয় যেখানে পাঠক আর কোনোকিছুই বিশ্বাস করতে রাজি হয়ে না এবং ক্রমশ ভালো খারাপ এর উর্দ্ধে যে একটি Grey Area আছে সেটার সন্ধান পায়।

শব্দ

শর্মিষ্ঠা গঙ্গোপাধ্যায়

ভবতোষ চৌধুরী মহাশয়ের আজ আনন্দের সীমা পরিসীমা নেই। তাঁর বড়োছেলের ঘরে ছেলে হয়েছে, আজ তাঁর নাতির অন্নপ্রাশন। বহু আত্মীয় স্বজনদের সমাগমে তাঁর দ্বিতল বাসভবনটি গমগম্ করছে। আজ ঘরভর্তি লোকজন শুধু ওই একটি ছোট্ট মানুষের কীর্তি কলাপ নিয়েই ব্যস্ত। কেউ বলে একদম দাদুর মতো দেখতে তো কেউ ঠাকুমার সাথে নাকের মিল খুঁজে পায়। কারোর চোখে আবার মাতৃমুখি ছেলে নাকি সুখী হয়। হঠাৎ করে মেজো বউ অনু বলে বসে" ভাগ্যিস বড়দির মতো গায়ের রং টা পায়নি। যা কালো বড়দি!" হ্যাঁ উমার গায়ের রং বেশ চাপা। তবু ও অতো লোকের মধ্যে ওভাবে বলাতে মূহুর্তে ওই আনন্দঘন পরিবেশ বদলে যায়। বড়ো বৌ উমা লজ্জায় মাথা নিচু করে। এক দূরসম্পর্কের ননদ সাথে সাথে প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বলে "তবে গুণ টা যেন মা এর মতোই হয়, এই আ শীর্বাদই করি।"

দিন গড়াতে থাকে। দুই বৌ নিয়ে চৌধুরী গিন্নিও চৌধুরী মাশাই সুখেই আছেন। ছোটো ছেলে রাণার ও টুকটাক বিয়ের সম্বন্ধ চলছে, খুব শিগগিরই হয়তো আবার সানাই বাজবে। তবু দিনে দিনে একটা সমস্যা খোঁচা দিচ্ছে। সে সমস্যা হলো মেজ বৌ অনু কে নিয়ে।না না এমনি সে খারাপ নয়, খুব মিশুকে হাসি খুশি স্বভাবের।এর ই মধ্যে বেশ মানিয়ে গুছিয়ে নিয়েছে সবার সাথে। তবু ওই"অতিকথন দোষ"তার আছে। কোনো কথা তার স্থান কাল পাত্র বিন্দুমাত্র বিচার না করেই দুম করে বলে বসে সে। সে কথা কার মনে কি ভাবে আঘাত করলো, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবে না সে।আর খুঁটি নাটি সব ব্যাপারে তার কথা দুমদাম বলা চাই-ই চাই। তার এই স্বভাবের দৌরাত্ম্যে মাঝে মাঝেই অনেকেই বিব্রত বোধ করে বৈকি।এই তো সেদিন বড়ো বৌ উমা ঘর গুছিয়েছিলো। বাড়িতে লোক বেড়াতে আসবে বলে। শাশুড়ি খুব খুশি। হঠাৎ করে মেজো বউ অনু বলে বসে, "এ মা বড়দি তুমি ফুলদানি টা টেবিলের উপর রেখেছো কেন? ওটা শোকেসের উপর ভালো লাগবে। আসলে তোমাদের বাড়ি তো দেখেছি এই সব রুম ডেকোরেশন এর খুব একটা চল্ নেই তো---তাই জানো না। মূহুর্তে বড়ো বৌ উমার মুখ টা ছোট হয়ে যায়। তবু কোনো ভ্রূক্ষেপ না করেই সে বলে চলে তার বাপের বাড়ির রুম ডেকোরেশন এর কথা। এমনকি সেদিন ছোট ছেলে রাণা ভোরবেলা বেরোবে বলে সাতসকালেই চৌধুরী গিন্নি চা করার জন্য র।এই সময়ে বড়ো বৌ উমা ঠাকুরঘরে থাকে। অমনি কোথা থেকে মেজো বউ অনু এসে বলে বসে, "মা আপনি বাসি কাপড়েই রান্না ঘরে ঢুকেছেন।"বৌ এর এ হেন কথায়

সক্কাল সক্কাল শাশুড়ি আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে। তিনি এবার ঠিক করেই ছাড়েন এর একটা বিহিত করতেই হবে। নিচের কিছু উচ্চ কণ্ঠে শাশুড়ির কথা শুনে উপরে ঠাকুর ঘর থেকে উমা নেমে এসে অনেক বুঝিয়ে শাশুড়ি কে নিবৃত্ত করে। কিন্তু অনু. . . ? সে যে কিছু দোষ করেছে তার মুখ দেখে বোঝা যায় না। মেজো বউ অনু স্বভাব দৌরাত্ম্য বেশ একখানা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় দিনে দিনে।

আজ বহুদিন পর রাঙা পিসি এসেছেন। সাথে ছোট ছেলে রানার জন্য একটা সম্বন্ধ ও নিয়ে এসেছেন। তাঁর ই দূর সম্পর্কের দেওরের মেয়ে। একখানা ছবি ও নিয়ে এসেছেন তিনি। বাড়ির প্রত্যেকের পছন্দ ও হয়েছে। রাঙা পিসি চৌধুরী গিন্নি কে খুব করে ধরেছেন। বলেন, "বৌদি, গরীবের দুঃখী মেয়ে। অল্পবয়সে বাবা মারা গেছে, মামাবাড়ি তে মানুষ । হয়তোবা সে বেশি দূর পড়াশোনা করে নি। মাধ্যমিক পাশ। তোমার আর দুই বৌ শিক্ষিতা ই বলা চলে। তবু ও বলছি এ মেয়ে তোমার পরিবারের অনুপযুক্ত হবে না।গুন আছে মেয়েটার।আমি জানি। বুদ্ধিমতী মেয়ে। তবু ও বলবো ছেলে তোমার, সিদ্ধান্ত ও তোমার। এক্ষেত্রে আর কেউই কোনো কথা বলেননি। কিন্তু বাক্ প্রবণা মেজো বউ অনু বলে বসে, "তা কি টুয়েলভ পাশ রাণার জন্য কি ডাক্তার মোক্তার আসবে?" হ্যাঁ রাণা টুয়েলভ পাশ।আর দুই দাদার মতো সে নয়। সংসারে সব ভাইবোন কখন ই সমান প্রতিষ্ঠিত হয় ও না তবু ও বাইরের কারো র সামনে নিজের ছোট ছেলে সম্পর্কে এমন অপ্রিয় সত্য কথাটা প্রকাশ হওয়ায় "মা' র মনে" লাগে"।এই অনুর মস্ত দোষ। তার কথার আবেগ বড্ড অপ্রতিরোধ্য।

যাই হোক একদিন ফাল্গুনী সন্ধ্যায় রূপা চৌধুরী পরিবারের ছোট বৌ হিসাবে পদার্পণ করলো।আর অচিরেই সকলের প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠলো।আর নিজের উপস্থিত বুদ্ধি তে সে অচিরেই বুঝে নিল তার "মেজদি" টি কে। কারণ বিয়ে হয়ে আসা ইস্তক তার এই স্বভাবের দৌরাত্ম্যে শিকার তাকেও হতে হয়েছে বৈকি এবং এই সংসারে যে ওর এই দোষের জন্য সকলকেই অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তে পড়তে হয়, সেটাও সুচতুরা রূপা বুঝতে পারছে।

সত্যিই যে শব্দ একটু হিসাব করে খরচ করলে ই বহু মানুষের মনে আনন্দের স্রোত বইয়ে দেওয়া যায় সেই শব্দেরই অনর্থক অবহেলিত উচ্চারণে আবার মানুষের চোখে জলের স্রোত ও বইয়ে দেওয়া যায়। অকারণ অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এই বেহিসাবী শব্দ প্রয়োগ।

যাই হোক, মাঝে বেশ কয়েকটি বছর ভালো মন্দে গত হয়েছে। আজ আবার চৌধুরী বাড়িতে বেশ সমারোহ। আজ রূপা- রাণার একমাত্র ছেলের চৌধুরী বাবুর ছোট নাতির অন্নপ্রাশন। সব আত্মীয় স্বজন আজ উপস্থিত। সবাই আজ চৌধুরী বাড়ির সবচেয়ে কনিষ্ঠ সদস্য কে আশীর্বাদ করছেন আশীর্বাদী ও দিচ্ছেন। উমার বাবা মা ও এসেছেন। সাথে আশীর্বাদী স্বরূপ একখানা আংটি ও এনেছেন। চৌধুরী গিন্নি বলেন, "ও বেয়ান আপ্নি নিজেই ওকে এটা পরিয়ে দিন।", উমার মা আংটিখানা পরাতে গিয়ে খানিক নাড়াচাড়া করে মেজো বউ অনু কে বলে, "অনু, তুমি এই আংটি টা দেখো তো পরাতে পারো কিনা। অনু ও বেশ কিছু ক্ষণ চেষ্টা করে ও দুরন্ত বাচ্চার আঙুলে সঠিক ভাবে আংটিখানা ঢুকাতে পারে না। অতঃপর একে একে সকলেই চেষ্টা করে কিন্তু ছোট্ট আঙ্গুলে ততোধিক ছোট একটা আংটি ঢোকাতে সকলেই ব্যর্থ হয়। তার উপর সকলের ঠেলাঠেলিতে ততক্ষণে দুরন্ত বাচ্চাটিও অস্থির হয়ে প্রচন্ড চিৎকারে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। অথচ সকলের মধ্যেই তখন এক উদগ্র বাসনার সৃষ্টি হয়েছে যে করে হোক সেই সঙ্গিন মুহূর্তেই আংটিটা পরাতেই হবে। এতক্ষণ কথনপ্রসিদ্ধা মেজো বউ চুপ করেই ছিল কিন্তু এবার তার বাঁধনহারা মুখ কথা বলে ওঠে, "এতো ছোট আংটি কেউ কখনও কেনে, এখন- ই পরানো যাচ্ছে না, কিছুদিন পরে তো আর পরতেই পারবে না। কিনলেন ই যখন তখন তো একটু বড়ো দেখে কিনলেই পারতেন। এ তো চোখেই দেখা যাচ্ছে না। মুহূর্তে বড়োবৌ এর বাবা মা এর চোখ মুখ লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন তাঁরা। আর সত্যিই সকলেই তখন আংটি পরাতেই ব্যস্ত ছিলেন আংটির আকৃতি প্রকৃতির দিকে তেমন করে কেউ নজর করেনি। ঠিক সেই মুহূর্তে রূপা এসে হাল ধরে। ছেলে কে কোলে নিয়ে একমূহুর্ত ভালো করে আংটি টা দেখে মূহুর্তে ছেলের আঙুলে পরিয়ে দেয়। তারপর বলে, "মেজদি তুমি খালি কথার ঠাকুর, ভালো করে আংটিটা দেখোই নি। আর এটা আমার ছেলের আঙুলে খুব সুন্দর মানিয়েছে। বাঃ, চমৎকার আংটি। আর ও এটা বহুদিন পরতে ও পারবে।" এবার সবাই তাকিয়ে দেখে সত্যিই খুব সুন্দর মানিয়েছে। আর ওনারাও স্বস্তি পান।

এবার মেজো বউ অনুর বাবা প্রতাপবাবু কথা বলেন, "অনু মা, তুমি ওনাদের কাছে ক্ষমা চাও।" চমকে ওঠে অনু। অম্লান বদনে বলে" কেন আমি কি করেছি"। প্রতাপবাবু বলেন, "তুমি ওনাদের অপমান করেছো। আজ ও কোথায় কি ভাবে কথা বলতে হয় সে শিক্ষা তোমার হয় নি। অবনী বাবুরা তোমার কথায় দুঃখ পেয়েছেন।" উমার বাবা অবনীবাবু বলেন, "না না আমরা কিছু মনে করিনি। ও আমার কন্যাসমা, " প্রতাপবাবু বলেন, "কিন্তু আমি মনে করেছি। আমি আমার মেয়েকে কথা বলতে শেখাতে পারিনি।" এখন ভয় হচ্ছে ওর এই কথনদোষে এই

সুন্দর পরিবার টি না ছারখার হয়ে যায়। এ যে মস্ত বড় দোষ। আবার অনুর দিকে তাকিয়ে বলেন, "কি হলো ক্ষমা চাও"। এতক্ষনে অনুর চোখ দিয়ে জল পড়তে শুরু করেছে। না এমনি তে সে খারাপ নয়। তবে ওই আর কি, যখন যা মনে আসে মুখ ফস্কে বলে দেয়। অতঃপর সে ক্ষমা চায়।

এবার পাশে এসে দাঁড়ায় শাশুড়ি মা, চৌধুরী গিন্নি। মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলেন, "অনু মা জানো, তো, এই কথা ই মানুষ মানুষকে কাছে টানে আবার কথাই মানুষের থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়। শব্দের অনেক ক্ষমতা। এ এক অমূল্য সম্পদ। একে অবহেলা করে অযত্নে ছড়িয়ে দিতে নেই। যত্ন করে সামলিয়ে রাখতে হয়। হিসাব করে সংসারে খরচ করতে হয়। আমি জানি তোমার এবার থেকে তুমি বাক্ সংযমী হবে। বাক্ শুদ্ধি হোক তোমার।" এবার প্রতাপবাবু ছোট বৌ রূপার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বলেন, "মা এভাবে ই তুমি উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে আর সুভাষিনী হয়ে এই সংসারকে আগলে রেখো। সংসার গড়তে যে দুটো অমূল্য সম্পদ লাগে তা তোমার মধ্যে এমনিতেই আছে। এরপর অনুষ্ঠান বাড়ি উৎসবের আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠলো।

আর সেদিনের পর থেকে অনুর স্বভাবের আমূল পরিবর্তনে তার পরিবার থেকে আত্মীয় মহল সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলো।

সরলরেখা ধরে

গোপেশ দে

দশ বছর পর প্রবালের সাথে শুক্লার দেখা।দেখা হল নিউমার্কেটে। প্রবালই শুক্লাকে প্রথম দেখে।শুক্লা একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোকের সাথে একটা বাচ্চা ছেলের হাত ধরে মার্কেটের রাস্তা ধরে যাচ্ছে।

প্রবাল আন্দাজ করে নিল শুক্লার বর আর ছেলে।কারণ এই দশ বছর ধরে শুক্লার কোনো খবর সে জানে না।

'কেমন আছো শুক্লা? ভাবতেই পারছি না এখানে দেখা হবে তোমার সাথে।' শুক্লা দেখল তার রাস্তা আটকে ধরে প্রবাল দাঁড়িয়ে আছে।সে থতমত খেয়ে গেল।কারণ তার বর অতিরিক্ত সন্দেহবাতিক।বরের উপস্থিতিতে কোনো পরিচিত অল্পবয়স্ক ছেলে তাকে কুশল জানালে বর খুব কটু দৃষ্টিতে তাকায়।

শুক্লার প্রবালের সাথে এতদিন দেখা হওয়ায় কথা বলতে ইচ্ছে করছিল।কিন্তু সাথে বর, বেশী কথা না বলাই শ্রেয়।কিন্তু একেবারে উত্তর না করাটাও বেশ খারাপ দেখায়।

শুক্লা বলল, 'ভালো। তুমি?'

'আছি।কতদিন পর দেখা বলোতো?'

শুক্লা ব্যস্ততা দেখিয়ে একটা শুকনো হাসি দিয়ে কোনো কথা না বলে প্রবালের পাশ কাটিয়ে একটা কফি শপের গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তার বর পার্থর দিকে চাইল।পার্থ কুটকুট করে চেয়ে আছে প্রবালের দিকে।প্রবাল শুক্লার দিকে চেয়ে আছে ভাবলেশহীন ভাবে।ছেলেটা এবার বাবাকে ডাকল, 'বাবা মা ডাকছে।'

শুক্লা জানে এই সামান্য দেখা আর কথার জন্য পার্থ তাকে জেরা করা শুরু করবে।' উফ ! অসহ্য !' বলে কফিশপের সামনেই দাঁড়িয়ে রইল।

প্রবাল অনেকটা দূর চলে গেছে হাঁটতে হাঁটতে।পার্থ বেশ কয়েকবার গোয়েন্দাদের মত তাকিয়ে চলে এল শুক্লার কাছে।

শুক্লা কফি শপে বসে ভাবছে পার্থকে কি সত্যিটা বলা যায় ? কে এই প্রবাল। না। কক্ষনো না। পার্থ দিলখোলা মানুষ না।তাকে প্রবাল সম্পর্কে কিছুই বলা যাবে না।

শুক্লা পার্থকে বিয়ের আগে বলেছিল, তার কোনো বন্ধু নেই।কোনো পাড়াতুতো দাদার সাথেও কথা বলে না। পার্থ তাকে খুব ভালোবাসে সেটা শুক্লা জানে কিন্তু সন্দেহবাতিক আর রাগ এই দুটো বিষয় শুক্লাকে অতিষ্ঠ করে দেয়। আসলে শুক্লা

মিথ্যে বলেছে পার্থকে। শুক্লার অনেক বন্ধুই ছিল স্কুল কলেজ মিলিয়ে। সেটা পার্থও কিছুটা টের পেয়েছে শ্বশুর বাড়ি গিয়ে।

শুক্লা পার্থকে নিয়ে বাপের বাড়ি গেলে পার্থর সন্দেহবাতিক ভাবটা বেড়ে যায়। শুক্লা নিজে যেচে কথা বলে না কোনো সহপাঠী বন্ধুর সাথে দেখা হলে। বরং ছেলেরাই নিজে থেকে কথা বলে আর পার্থ সাথে থাকলে ব্যাস ওই ছেলে সম্পর্কে জানতে চাইবে বেশ রাগী চোখে।

' কে এই ছেলেটা?'

শুক্লা ভ্যানিটি ব্যাগটা টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বলল, তোমার জানাটা কি জরুরী?

' হ্যাঁ জরুরী। ছেলেটা কে?'

' ঠিক চিনি না।'

' চেনো না মানে। তাহলে কথা বলতে গেছিলে কেন?' পার্থ চেচিয়ে ওঠে

' আমি আবার কোথায় কথা বলতে গেলাম?'

' তুমি বললে ভালো আছি। তুমি? আমি কি কিছুই শুনিনি। আমি কি কানে কম শুনি।' বেশ জোরেই বলল পার্থ।

' আস্তে বল। এটা কফি শপ।'

' কফি শপের গুল্লি মারি। ওই বোকা... (অকথ্য ভাষা) ছেলেটা কি হয় তোমার বলো ?'

শুক্লা বুঝত পারছে পার্থ খুব ক্ষেপে আছে। ক্ষেপে গেলে বাজে ভাষা বেরিয়ে যায় তার। তখন কে বলবে পার্থ একজন সরকারী চাকুরে।

শুক্লা ভাবল আজ আর কফি খাওয়া হবে না। পুরো দিনটাই মাটি হবে। আর রাতেও একই ঘ্যানঘ্যান শুনতে হবে তার।

' তুমি যদি জোরে কথা বলো। তাহলে আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাব।'

' তুমি বলবে ওই শুয়োরছানাটি কে?'

শুক্লার লজ্জা আর অপমানে মাথা হেট হয়ে যাচ্ছিল। আশেপাশের দু চারজন লোক তাদের দিকে তাকালো। একটা ছেলে বসে হাল্কা মেজাজে গীটার বাজাচ্ছিল বলে পার্থর কণ্ঠ বেশী দূর যায়নি।

শুক্লা ছেলের হাত ধরে কফি শপ থেকে বেরিয়ে গেল। পার্থও পিছন পিছন ছুটল। পার্থ দেখল শুক্লা জেব্রা ক্রসিং পার হয়ে অন্য দিকে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সেও ছুট। একটা ট্যাক্সিকে ডাকতে যাবে শুক্লা সেই মুহুর্তে পার্থ শুক্লার সামনে এসে হাজির।

' তুমি কোথায় যাচ্ছ ? ওই ছেলের কাছে ? ওকে পেলে আস্ত গিলে খাব।'

শুক্লা এবার খেই দিয়ে উঠল, ' এখান থেকে তুমি যাও আমাকে আমার মত কিছুক্ষণ থাকতে দাও।'

' এখন তো চাইবেই। আমার খাবে আমার পড়বে। আর পীরিতি ওই ছেলের সাথে।'

শুক্লা বলে উঠল, 'তুমি রাস্তা ছাড়বে না হলে লোক জড়ো করব।'
কলকাতা শহরে কেউ ঝগড়া করলে মানুষ সেভাবে তাকিয়ে দেখে না। সবাই ব্যস্ত। কিন্তু একটা মেয়ে লোকের ব্যাপার আলাদা। ইভ টিজিং, নারী উত্ত্যক্ত এই জাতীয় কিছু আন্দাজ পেলে দু' চারটে লোক এসে জড়ো হয়। যেমনটি এইমাত্র হল।
একজন লোক শুক্লা আর পার্থর মাঝখানে চলে এসে হরহর করে বলে গেল, 'কী হয়েছে দিদি? আমাদের বলুন। লোকটা কে?'
'এই শালা তুই জানতে চাইছিস লোকটা কে?' পার্থ যেন হাত উঠালো।
এতে শুক্লা আরো রেগে গেল, 'আমি চিনি না।'
ব্যস একটা লুঙ্গি পরা লোক কলার চেপে বলল, 'তোকে তো চিনে না।'
'আমি ওর হাজব্যান্ড। আর তুই আমার কলার চেপেছিস শালা। আমি কে জানিস ?'
আরেকটা লোক পার্থর কানের নিচে ঘুসি বসিয়ে দিল। পার্থ যেন কিছু সময়ের জন্য চোখে মুখে অন্ধকার দেখল।
ছেলে ভয়ে মায়ের হাত কুকড়ে ধরে বলল, 'মা বাবাকে ওরা মারছে।'
এবার লোকগুলো থমকে তাকালো ছেলেটার দিকে।
এক ঝটকায় লোক গুলো সরে পরল। পার্থ নিজেকে সামলে বেশ অসহায় ভাবে তাকালো শুক্লার দিকে, 'কতগুলো ছোটলোক দিয়ে মার খাওয়ালে তুমি।'
শুক্লা কোনো কথা না বলে হাঁটতে শুরু করল।
পার্থ আবার পিছু নিয়ে বলল, 'তোমার ওই ছেলেটি কে? তোমার প্রেমিক ?'
শুক্লা পার্থর কথা পাত্তা না দিয়ে একটা টাক্সি দাড় করানো দেখে তাতে উঠে পড়ল। এত দ্রুত ট্যাক্সিতে উঠল শুক্লা যে পার্থ হাঁ করে তাকিয়ে শুধু দেখল।
দূর থেকে প্রবাল সবটাই দেখছিল। একটা স্কুটি নিয়ে কফি সপের ধারে কাছেই অপেক্ষা করছিল শুক্লার জন্য তার বাড়ি চিনবে বলে। শুক্লাকে ট্যাক্সিতে উঠতে দেখে সেও স্কুটার নিয়ে চলছে ট্যাক্সির পিছুপিছু।

কথাটা ভুল বলেনি পার্থ। শুক্লার প্রাক্তন প্রেমিক প্রবাল। শুক্লা গাড়িতে বসে সেই দশ বছর আগের জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করতে লাগল।
উচ্চমাধ্যমিকে থাকতে প্রবালের সাথে সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল তার। একই পাড়ার থাকত তারা।
প্রবাল তখন সবে কলেজে ভর্তি হয়েছে। প্রেম চলল এক বছর। সেই এক বছরে শুক্লা প্রবালের সাথে প্রচুর ঘুরেছে বাড়ির লোকদের ফাঁকি দিয়ে। শুক্লাকে প্রায়ই প্রবাল তার বাড়িতে নিয়ে যেত। ওর বাবা মা যেদিন থাকত না। শুক্লার সাথে অনেক ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেছিল প্রবাল কিন্তু শুক্লা সেটায় সায় দেয়নি। প্রবালও বেশী জোর করত না। তবে যেটা হত সেটাও অনেক।

শুক্লার প্রবালের একটা জিনিস বেশী ভালো লাগত সেটা হল প্রবাল শুক্লার কথাকে দাম দিত। তার অনিচ্ছাকে সম্মান জানাত।

তখন শুক্লারা থাকত বারাসাতে। আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকায় প্রবাল চলে গেল মহারাষ্ট্রে একটি কারখানায় কাজের সন্ধান পেয়ে। প্রেম চলল ফোনে। কথা ছিল দু বছর পর ওকে বিয়ে করবে প্রবাল। বাবা মা একদিন জানতে পারলেন তাঁদের মেয়ের একটা ছেলের সাথে সম্পর্ক।

বাবা অনেক গালমন্দ পারলেন, ' আমাদের ফ্যামিলিতে আজ অব্দি কোনো মেয়ে রিলেশন করেনি। আর তুই কিনা ?'

মাও সমান তালে গালমন্দ পারলেন।

শুক্লার বাবার বদলীর চাকরি। শুক্লার বাবা বদলী হয়ে বোলপুরে চলে এলো পুরো ফ্যামিলিকে নিয়ে।

তারপর দেখাশোনার মাধ্যমে হুট করে বিয়ে হয়ে গেল পার্থর সাথে। প্রবালের সাথে সব সম্পর্ক চুকে গেল।

বিয়ের দিন দুই আগে সিম বন্ধ করে দিল শুক্লা। প্রবালকে বলেনি তার বিয়ে। এমনকি বোলপুরের ঠিকানাটাও প্রবালকে দেয়নি শুক্লা। প্রবাল কোনোভাবেই আর যোগাযোগ করতে পারেনি শুক্লার সাথে।

একদিন হুট করে প্রবাল চলে আসে শুক্লার ফ্ল্যাটে। শুক্লা আর কাজের মহিলা ঘরে ছিল। ছেলেটা স্কুলে। দরজা শুক্লাই খুলল। প্রবালকে দেখে বিস্মিত হয়ে গেল শুক্লা।

' ভিতরে আসতে বলবে না ?'

শুক্লা কিছুক্ষণের জন্য ভাবল ঘরে কাজের মহিলা আছে। সে যদি পার্থকে বলে দেয় তাহলে সোজা ডিভোর্স। বড় রকমের ঝামেলা লেগে যাবে বাসায়। তাই একটু বুদ্ধি খাটিয়ে বলল, ' তুমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াও আমি বের হচ্ছি।'

কাজের মহিলাকে ছুটি দিয়ে ঘর লক করে শুক্লা বেরিয়ে এল রাস্তায়।

একটা রেস্টুরেন্টে বসে অনেক গল্প হল ওদের। প্রবাল কিভাবে ঠিকানাটা পেল সেটা শুক্লা জানতে পারল। শুক্লার কিভাবে বিয়ে হল সেটাও জানল প্রবাল।

শুক্লার মনের মধ্যে পুরোনো ভালোবাসা জেগে উঠল। প্রবালকে সে অনেক ভালোবেসেছিল। কথা ছিল দুজন দুজনকে বিয়ে করবে।

প্রবাল এখন কলকাতাতেই থাকে। একটা কারখানায় ম্যানেজারের দায়িত্বে আছে। একটা মেসে থাকে সে।

রেস্টুরেন্টে বসেই শুক্লা প্রবালের ঠিকানাটা নিল। কিন্তু নিজের মোবাইল নম্বরটা দিল না প্রবালকে পার্থর ভয়ে। প্রবালও বেশ জোড় করল না।

প্রবাল এখানে আসার খবরটা পার্থর কানে গেল পরের দিন সকাল বেলা। কাজের মহিলাটাই বলে দিল ব্যাপারটা। সকাল বেলা বাড়িতে লেগে গেল তুলকালাম।
অকথ্য ভাষায় গালাগাল করল পার্থ শুক্লাকে আর প্রবালকে। তারপর আছড়ে ভাঙল শুক্লার মোবাইল ফোন।
পার্থর মোবাইল ভাঙা দেখে শুক্লার জেদ আরো বেড়ে গেল। সে ভাবল প্রবালের সাথে আরো বেশী বেশী দেখা করবে। সংসারটা না টিকলে কিছুই এসে যায় না শুক্লার এখন। এই উন্মাদকে না বিয়ে করলেই হত। প্রবালকে বিয়ে করলে কত সুখিই না হত সে।

শুক্লার বাড়ির সামনে প্রায় রোজই প্রবাল চলে আসে। পার্থ কখন অফিসে যায় সেই তক্কে তক্কে থাকে প্রবাল। তারপর সোজা বাসায় চলে যায়। শুক্লা রেডী হয়ে ছেলেকে স্কুলে দিয়ে প্রবালের সাথে বাইরে বেড়াতে যায়। কাজের মহিলাকে ছেড়ে দিয়েছে শুক্লা। ছেলে অবশ্য এ ব্যাপারে বাবাকে কিছুই বলে না। বাচ্চা ছেলে সে কীই বা বোঝে!
শুক্লার পুরোনো ভালবাসার স্মৃতি জেগে উঠে। প্রবালের সাথে ঘুরতে তার ভালো লাগে।
পার্থ ভিতরে ভিতরে সবই বুঝতে পারত প্রবালের সাথে ঘুরতে যায় শুক্লা।
পার্থ এখন আর শুক্লার ওপর রাগ করে না। সে অফিসে যায় মনমরা হয়ে অফিস থেকে আসেও সেই একই চেহারায়। এখন আর চেহারায় রাগী ভাবটা নেই তার। কেমন যেন সংসারে উদাসীন হয়ে যেতে লাগল সে। শুক্লা আর পার্থ এখন আর এক ঘরে ঘুমায় না। ছেলেটা বাবার সাথেই ঘুমায়।

পার্থর রাতে ঘুম হয় না। সে গভীর রাত পর্যন্ত ব্যালকনিতে থাকে। শুক্লাকে সে অনেক ভালোবাসে। সেটা কেন শুক্লা বুঝতে চায় না ? তার দোষটা কোথায় ? শুক্লা কি তাকে ডিভোর্স দিয়ে ওই ছেলেকে বিয়ে করবে ? খোকনের হবে কি তাহলে ? খোকন কি তার মায়ের সাথে থাকবে ? একটা সময় চোখের কোণে জল চলে আসে পার্থর। কেন তার এমন হল ? এসব এলোপাথাড়ি ভাবতে ভাবতে নিজেকে পাগলের মত লাগে আজকাল। ঘরের জিনিসপত্র ভাঙতে তার মন চায় কিন্তু না তবুও নিজেকে আত্মসংবরণ করে।

আজ বিকেল থেকে শুক্লার কেমন যেন মনটা খচখচে লাগছে। সকালে পার্থর দিকে ভাল করে একটু তাকিয়ে ছিল সে। হঠাৎ কেমন একটা মায়া আচ্ছন্ন হল যেন তার প্রতি। পার্থর চোখের নিচে কালি। এক গোছা সাদা পাকা দাড়ি। খাওয়ার সময় কেমন বাচ্চাদের মত যেন খাচ্ছিল। পার্থর মুখটা কেমন যেন নিষ্পাপ

লাগছিল শুক্লার। সেই থেকে তার খচখচ করছে মনটা। সে কি পাপ করছে না ? বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কি ? খোকনের লাইফের কি হবে ? মানুষটা কেমন বুড়োটে উদাসীন হয়ে যাচ্ছে। কেমন অসহায়ের মত চারপাশ তাকাচ্ছিল খাওয়ার সময়।

পার্থ যে তাকে অনেক ভালোবাসে সেটা শুক্লা বুঝতে পারে। না সম্পর্কটা এভাবে ভাঙা ঠিক হবে না। বুকের মধ্যে পার্থর অনেক কষ্ট জমে আছে। সেটাকে পাথর করতে দেয়া যায় না। অনেক রাগী হলেও পার্থর মনটা তো সহজ সরল। ভাবল শুক্লা। বিছানায় এ পিঠ ও পিঠ করল ঘুমানোর জন্য বেশ কিছুক্ষণ। ঘুমের চিহ্ন মাত্র নেই। এক সময় উঠে পড়ল বিছানা থেকে। পার্থর রুমে ঢুকল খোকনকে দেখতে। খোকন ঘুমাচ্ছে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিল শুক্লা।
শুক্লা সিদ্ধান্ত নিল আজ রাতেই ক্ষমা চেয়ে নেবে পার্থর কাছে। নিশ্চয়ই তাকে ক্ষমা করে দেবে পার্থ। প্রবালের সাথে আর কোনো দেখা সাক্ষাৎ নয়। প্রবাল যে তার লাইফে ছিল সেটাই ভুলে যাবে সে।
রাতে শুক্লা পার্থর ঘরে গেল। পার্থ ব্যালকনিতে বসে আছে একটা চেয়ার নিয়ে। শুক্লা সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পার্থ তাকে দেখামাত্রই বলল, ' তুমি ঘুমাও নি ?'
' তুমিও তো ঘুমাও নি।'
আমার এখানে বসে থাকতে ভালো লাগে।
' কই আগে তো ব্যালকনিতে একদন্দও বসতে না, ' শুক্লা একটু হাসল।
পার্থ অবজ্ঞার সুরে বলল, ' মানুষ বদলে যায় এটাই তো স্বাভাবিক।'
শুক্লা বুঝতে পারছে ভিতরে অনেক ক্ষত জমেছে পার্থর। ক্ষতটা তো সেই জমিয়েছে পার্থর বুকে।
ব্যালকনির দিকে তাকিয়ে পার্থ বলল, ' আমার জীবনের একটা ক্ষুদ্র গল্প শুনবে ?'
' গল্প। হ্যাঁ বলো।' শুক্লা পার্থকে খুশি করার চেষ্টা করে।
' আমি খুব গরীব ঘরের ছেলে সেটা তুমি আগেও শুনেছ। আমি পড়াশুনায় ভালই ছিলাম। অনেক দারিদের্য্র মধ্যেও পড়াশুনা ছাড়িনি। বাবা ঠিকমত টাকা দিতে পারত না পড়াশুনার পিছনে। টিউশনি করে কলেজে পড়াশুনা করতাম। আমি কলেজের মেয়েদের সাথে মিশতাম না। কথাও বলতাম না। বন্ধু বলতেও তেমন কেউ ছিল না। শুধু একটা স্বপ্ন দেখতাম ভালো একটা চাকরি পেয়ে এমন মেয়েকে বিয়ে করব যে শুধু আমাকে ভালোবাসবে আর কাউকে না। আমিও তাকে উজার করে ভালোবাসব কারণ আমার এই মনে তো কাউকে কোনোদিন স্থান দিইনি। যা ভালোবাসা সব বিয়ের পরে। আমার অনেক বন্ধুই তখন একটা প্রেম করে একটা ছাড়ে। আমি ভাবতাম আমি ওদের থেকে অনেক সৎ, পবিত্র। আমার জন্য ভালো

মেয়েই অপেক্ষা করছে যে বিয়ের আগে প্রেম করেনি। এই স্বপ্ন বুকে পুষে রেখেছিলাম। সেটা সত্যি হল না।'

শুক্লা খুব মনোযোগে পুরো কথা শুনল।

' তোমাকে অনেক ভালবাসি শুক্লা। অনেক ভালোবাসি বলেই চোখে চোখে রাখতাম তোমায়। তোমার সাথে কোনো ছেলে কথা বললে আমার কোনদিনই খারাপ লাগেনি। শুধু জানতে চাইতাম ছেলেটা কে ? হয়ত তুমি ভাবতে আমি তোমায় সন্দেহ করি। আমার বলার ধরণটা হয়ত বাজে লাগত তোমার কাছে। আসলে আমি গুছিয়ে কথা বলতে পারি না। তুমি এড়িয়ে যেতে বলে আমার অনেক সন্দেহ হত। অল্পতেই রেগে যাই আমি। এটাই আমার দোষ।'

শুক্লা পার্থর হাতটা ধরল। সত্যি ! পার্থর স্বপ্নটা সত্যি হল না। পার্থ যে মেয়েকে স্বপ্নে ভেবেছে সেই মেয়ে সে নয়। তার নিজের স্বপ্নও তো সত্যি হল না। তবুও এই মানুষটিই এখন তার সব।

শুক্লা বলল, ' আই আম সরি !'

পার্থ শুকনো হেসে বলল, ' সরি বলতে হবে না। তোমার যা ভালো লাগে করো। আমি বাঁধা দেব না। শুধু ডিভোর্স টা মাথায় এনো না। সেটা মানতে পারব না। আমি তাহলে নিঃসঙ্গ হয়ে যাব।'

শুক্লা বলল, ' তুমি আমাকে আর খারাপ ভেবো না। সব আগের মত হয়ে যাবে। তুমি আগের মত একটু রাগ করবে ?'

পার্থ শুক্লার হাত ধরে বলল, ' ওই ছেলেটি কে ? বলা যাবে ?'

শুক্লা ভাবল গোপন করে কোনো লাভ নেই। এই মানুষটিকে সব বলা যায় এখন। সে সবটাই বলল।

পার্থ সব শুনে চুপ করে রইল।

শুক্লা বলল, ' আমার জীবনে এখন তুমি আর খোকন। এই লাইফে শুধু তোমরাই আছ । অন্য কাউকে জায়গা দেয়া কোনোদিনও সম্ভব না। আমি অনেক বড় একটা ভুল করতে যাচ্ছিলাম। সেটা এখন বুঝতে পারছি। আমাদের জীবনটা সরলরেখা ধরেই চলুক। পার্থ বাইরের দিকে তাকালো। নিয়ন আলোয় ঝলমল করছে রাত।

কাগজ কুড়ানি

রঞ্জন ব্যানার্জী

আজ এক সপ্তাহ হলো এই নতুন জায়গাটায় এসেছি আমরা। আমি বাবা, মা, আর ছোটো বোন। রেললাইনের ধারে ঝুপড়ি বস্তিতে। আগে অনেকটা দূরে একটা গঞ্জ মতো ছিলো একটা রেললাইনের ধারে সেখানে ছিলাম। আমি কাগজ কুড়িয়ে বেড়াই। বাবা মা সবাই এই কাজ করি। আগে গঞ্জ মতো জায়গা খুব ভালো ছিলো। কতো লোকজন, গাড়িতে রাস্তাটা সবসময় জমজমাট থাকতো। কিন্তু একবার কি হলো ছেলেধরা সন্দেহে সবাই আমাদের এই বস্তাটার দিকে কেমন সন্দেহের চোখে দেখতো। বাবাকে রোজ কতবার করে যে বস্তাটা উল্টেপাল্টে দেখাতে হতো আর কতো কতো প্রশ্ন তার জবাবও ঠিক ঠিক দিতে হতো। তবেই রেহাই। তাই বাবা খোঁজখবর নিয়ে এই রেললাইনের ঝুপড়িতে চলে আসে আমাদের নিয়ে। এখানকার জায়গাটা নিরিবিলি। লোকজন খুব কম। বাবা বারণ করে দিয়েছে বেশি লোকালয়ে না যেতে। কখন কি হয়। চারিদিকে কেমন ছেলেধরা ছেলেধরা বলে যাকে পারছে মারছে। আর লোকজন একবার মারতে শুরু করলে প্রাণ বাঁচানো দায় হয়ে পড়ে। সেইজন্য আমি লোকজন কম এমন জায়গায় বেশি ঘোরাঘুরি করে কাগজ কুড়াই।

আগের জায়গাটার কথা খুব মনে পড়ে। ওখানে রেললাইনের ধারে একটা মাঠ ছিল। ফুটবল ক্রিকেট খেলা হতো। আমি বিকেলবেলা করে দেখতাম। আবার দুর্গাপুজোর সময় ধুমধাম করে পুজো হতো। বড়ো বড়ো দাদাদের ফাইফরমাস খেটে দিতাম। প্যান্ডেলের ভিতরে নোংরা কাগজ প্লাস্টিক থাকলে দুবেলা ঝাঁট দিয়ে দিতাম। বখশিস দশ কুড়ি টাকাও দিতো। তাই দিয়ে রাতের বেলা ঘুগনি আলুকাবলি অনেকসময় একটা গোটা এগরোলও হয়ে যেতো। আর পুজো শেষ হলে আমাকে একটা নতুন কাপড় দিতো যেগুলি মায়ের কাছে লোকেরা পুজো দিতো সেগুলো থেকে। আমি আনন্দে নাচতে নাচতে মা কে এনে দিতাম। আমরা দু বছর ছিলাম ওখানে। সকাল সন্ধ্যা দুচোখ ভরে খালি দুগ্গামাকে দেখতাম। আর বলতাম "মাগো প্রত্যেক বছর তোমাকে দুচোখ ভরে যেনো দেখতে পাই। আর যেনো প্রত্যেক বছর খুব আনন্দ করতে পারি। পুজোর এই কদিন আমি কোনো কাজ করতাম না। সকাল থেকেই প্যান্ডেলে বসে থাকতাম আর কেমন করে পুজো হয় তা দেখতাম। ক্লাবের বড়ো দাদারা অনেকে আমাকে দিয়ে অনেক কাজ করাতো, সিগারেট আনতে পাঠাতো। আমি হসিমুখেই এনে দিতাম। দুপুরে ভোগ খেতে দিতো। খুব ভালোও বাসতো ওরা।

নতুন জায়গাটায় চলে এসে সব ওলটপালট হয়ে গেলো। এখানে অনেকদিন হয়ে গেলো এসেছি। একদিন বাবাকে জিজ্ঞেসও করেছিলাম দুর্গাপুজো কবে। বাবা বলতে পারেনি। আমারও আর খোঁজও নেয়া হয়নি। এখানে ওখানকার মতো এতো ঝাঁকঝমক নেই কোনো কিছুতেই। জায়গাটা একটু গ্রাম্য মতো শান্ত নিরিবিলি। তাই পুজোর ব্যাপারটা মাথা থেকে একদম বেরিয়ে গেছিলো।

একদিন একা একা অনেকদূর চলে এসেছি আনমনা হয়ে। সেদিন ভালো কিছু কুড়োতে পারিনি। আনমনা হয়ে একটু লোকালয়ে চলে এসেছি। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরলো একটা কোলাহল আওয়াজে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। একটু দূর থেকে আমাদের পাশের ঝুপড়ির গদাইকাকাকে ধরে সবাই মারছে আর হৈ হল্লা করতে করতে বস্তাটাকে রাস্তায় উপুড় করে ঢেলে কি যেনো খুঁজছে। আর গদাইকাকা হাতজোড় করে কাকুতিমিনতি করছে ছেড়ে দেবার জন্য। বাবা বলেদিয়েছিলো এরকম ব্যাপার দেখলেই দৌড়ে বস্তা ফেলে পালাবি। আগে প্রাণ পরে বস্তা। আমি বস্তাটাকে গুটিয়ে গুটিয়ে ছোটো করে একটা ডাস্টবিনের পাশে লুকিয়েই উর্দ্বশ্বাসে দৌড় লাগালাম। সবাই কিছু বোঝার আগেই এগলি ওগলি করে দৌড়তে লাগলাম। কিন্তু আমি এদিকের কোনো রাস্তাই চিনিনা। তাই রাস্তা হারিয়ে ফেললাম। অনেকক্ষন দৌড়ানোর জন্য হাঁফিয়েও উঠেছিলাম। তাই দূরে একটা মন্দিরের থেকে আসা শঙ্খ আর উলুধ্বনি শুনে ওদিকেই গেলাম একটু জিরিয়ে নিতে। কেউ আমাকে তারাও করেনি বা কেউ দেখছেও না তাই আসতে আসতে হেঁটে মন্দিরের চাতালের দিকে এগোলাম বসে জিরিয়ে নেবো বলে। চাতালের সিঁড়িটাই পা রাখতেই ধুপ ধুনোর গন্ধে মন পাগল হয়ে উঠলো। তাকিয়ে দেখি মন্দির আলো করে দাঁড়িয়ে আছে আমার দুগ্গামা। কি সুন্দর টানা টানা চোখে মা যেনো আমাকে ডাকছে আর মিটিমিটি করে হাসছে। আজকে দুগ্গামায়ের পুজো আমি জানতাম না। আমি পায়ে পায়ে মন্দিরের চাতালে উঠে দুগ্গামা কে নালিশ জানালাম -" মা তুমি এসে গেছো, আমি জানতেও পারলাম না। একবার বলতে তো পারতে আমাকে, কি সুন্দর সবাইকে নিয়ে এসেছো। আর আমি তোমাকে দেখতেই পেতাম না যদি না ....
দুগ্গামার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললাম।।

শুভেচ্ছা ও উৎসাহে

AQUAA LIFE™
A - Z Water Treatment Solutions
Kitchen Life™
Chimney & Moduler Kitchen
IRON REMOVER
৩০% ছাড়
৩০% ছাড়
হোল সেল। রিটেল সেল। সার্ভিসিং
9231518040
WaTreat India
Mirhati, Amdanga, Kol-125
www.watreatindia.com
watreatindia@gmail.com

শুভেচ্ছা ও উৎসাহে

National Youth Computer Training Academy
ন্যাশনাল ইয়ুথ কম্পিউটার ট্রেনিং অ্যাকাডেমী
An Autonomous I.T. Academy Registered Under Govt. Of West Bengal
NYCTA
Committed To Build Youth
Computer Education Under The Guidelines Of
Ministry Of Information Technology, Govt. Of India.
An ISO 9001:2015 Certified
SPOKEN ENGLISH
On-line Study Facility Available
A TRAINING DIVISION OF
EXPERTZ DIGITECH SOLUTIONS(EDS)
(WWW.SIINFOSOLUTIONS.COM)
CITA DITA CCA
DPHP IT-DIGITAL E-MINOR
E-KIDS CIPL ADVANCED EXCEL
Website: www.nycta.in
Associate Training Partner:
EXPERTZ IT ACADEMY
Learning Today.. Leading Tomorrow..
www.nycta.in
8345015195 / 8918457443
Qualified teachers
Excellent Infrastructures
Detailed Study Materials
Lower Fees Structure
কম্পিউটার শিক্ষার কোন বিকল্প নেই
Wi Fi
Highspeed Internet Coverage
CONTACT ADDRESS
ULUDANGA, AMDANGA

কম্পিটে কলরব

শব্দছক - ১

সমীর জানা
প্রধানশিক্ষক, সাধনপুর উলুডাঙ্গা তুলসীরাম হাইস্কুল

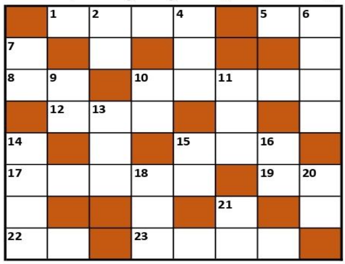

সূত্র

পাশাপাশি - 1. সমগ্র পৃথিবী, 5. তাম্বুল, 8. পর্বত, 10. ভাগ্যের উন্নতি হওয়া, 12. হোগলা, বেত প্রভৃতি দিয়ে তৈরি বড় ধান রাখার গোলা বা পাত্র, 15. শুভ বা কল্যাণ, 17. জেলার সদর শহর, 19. কষা, রসপূর্ণ ও আঠাযুক্ত গোলাকার ফলবিশেষ, 22. শঙ্খ, 23. চন্ডী।

উপরনীচ - 2. নিশি, 4. আগেকার দিনে দ্রুত একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত বাঁশের পা বিশেষ, 6. ভেট বা সেলামি, 7. জঙ্গল, 9. ভোজ্য শষ্যবিশেষ, 10. পিঠে শক্ত কাঁটাযুক্ত এবং হাঁটতে পারে এমন মাছ বিশেষ, 11. মশলা বা মুখশুদ্ধির উপকরণরূপে ব্যবহৃত শুষ্ক ফুলবিশেষ, 13. ভাঙা বাড়ির নোংরা ও আবর্জনা, 14. ঘরের মেঝে ইত্যাদিতে রঙিন পাথরের টুকরো দিয়ে তৈরি সুদৃশ্য আস্তরণ, 15. মরণশিল বা নশ্বর, 16. বাঁশ ইত্যাদির তৈরি লম্বা দন্ড, 18. ফেরিওয়ালা, 20. আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দেহাবরণ, 21. গাছের ডাল বা পাতলা কাঠ হঠাৎ ভাঙার শব্দ।

উত্তর পাঠাবেন ইমেল করে ১লা মার্চের মধ্যে।

যারা বিভিন্ন সময়ে ' কলরব এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি' র বিভিন্ন কাজে সাহায্য করেছে -----------

সফল হাউলি, মধুমিতা ধাড়া, বসিরউদ্দিন মন্ডল, আলফা গাজী, আলিশা গাজী, তানিয়া সুলতানা, মুন্সি শবনম, সবনম সুলতানা, সুমাইয়া ইয়াসমিন, রুবিনা ইয়াসমিন, সবনম সুলতানা, জয়দীপ প্রামানিক, অরিজিত বিশ্বাস, পৌলমী ঘোষ, জসীমউদ্দীন, জসিমউদ্দিন মন্ডল, সহেলী পারভীন, সুজানা খাতুন, অর্পিতা কর্মকার, প্রিয়া মোড়ল, তুলি মুখার্জি, অনিশ কর্মকার, রাফিকা খাতুন, পায়েল ঋষি দাস, সোহানা ইয়াসমিন, আশিক উল্লাহ, চৈতালি বেরা, বিদিশা পাড়ুই, রুকসানা খাতুন, অপর্ণা সামন্ত, শান্তনু ঘোষ, সারফাজ উদ্দিন ইসলাম, সাহিল হক, জুবের মণ্ডল, হাসানুর মণ্ডল, আজিজুল মণ্ডল, নিসার হামদুন, ডলি শবনম, জাহেদুর রহমান, নেহালা বেগম।

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

১) সুরুচি সম্পন্ন যে কোন লেখা ' কলরব' -এ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে।

২) কবিতা ৪০ লাইনের ও গল্প এবং প্রবন্ধ ৩০০০ শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩) Unicode font -এ মেইল বডিতে টাইপ করে বা ডকুমেন্ট ফাইল করে পাঠাতে হবে।

৪) লেখা সম্পূর্ণভাবে নির্বাচিত হবে নির্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা। লেখা ছাপা না হলে ' টিম কলরব' লেখা ফেরত ও কোন রকম ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য বাধ্য থাকবে না।

৫) লেখা জমা বা যে কোন রকমের পরামর্শ দেওয়ার প্রদান বা আর্থিক সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন -

কলরব এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি

এন.এইচ. ৩৪, আমডাঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগনা

পিনঃ ৭৪৩২২১, পশ্চিমবঙ্গ

ই-মেলঃ kolorobteam@gmail.com

কথাঃ ৮২৭৬৮৩৯৩৮০